BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

বায়ু চতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

ইংরাজি ভাষা হইতে অনুবাদিত

CALCUTTA:

Printed for the Vernacular Literature Committee,
at the Sucharu Press, by Lallchand Biswas
and Co.

1858.

Price 1½ Annas—মূল্য /১০ ছয় পয়সা।

[illegible] যাঁহার প্রয়োজন হইবে, গরাণহাট্টার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৩।১ সঙ্খ্যক গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ নামক পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হইবেন।]

বায়ু চতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা।

একদা এক রাজপুত্র অনেক প্রকার উত্তমোত্তম পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক অতিশয় বিদ্যানুশীলন করিতে আরম্ভ করেন, তৎপূর্ব্বে কোন ব্যক্তিরই এত পুস্তক সংগ্রহ ছিল না। ধরণীতলে যত প্রকার ঘটনা উপস্থিত হয়, সকলই সেই সকল পুস্তকে লিখিত ছিল, আর নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর চিত্র দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত হওয়াতে রাজকুমার সেই গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া উত্তমরূপে তাহার ভাব বুঝিতে পারিতেন। যে কোন দেশ, এবং যে কোন জাতি হউক না কেন, সকলেরই বৃত্তান্ত তিনি পুস্তক পাঠে জানিতে পারিতেন, কেবল ভুবনরূপ উদ্যান কিরূপ ও কোথায় আছে, তাহার বৃত্তান্ত তিনি কোথাও পাইতেন না; অতএব ইহারই নিশ্চয় করণার্থ তিনি বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। শৈশব কালে রাজকুমার যখন পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করেন, তৎকালে তাঁহার পিতামহ এক দিন ঐ ভুবনরূপ উদ্যানের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, তথাকার

প্রত্যেক পুষ্পই এক একটি সন্দেশের ন্যায়, এবং তন্মধ্যে যত গুলীন পুষ্পকেশর আছে সকলই মধুতে পরিপূর্ণ; কোনটায় ইতিহাস বৃত্তান্ত লেখা, কাহাতেও বা ভূগোল এবং অঙ্ক শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে, অতএব তত্রস্থ বালক-দিগের পাঠ অভ্যাস করণের প্রয়োজন হয় না, যে বালক যত সন্দেশ খায়, সে তত ইতিহাস ভূগোল এবং অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারে। পিতামহের এই কথায় তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। বয়োবৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয়, তখন বালক কালের অতি আদ-রণীয় মিঠাই মণ্ডার প্রতি বড় একটা সমাদর থাকে না, বরং সামান্য বোধ হয়। অতএব রাজকুমার কিছু বয়স্ক হইয়া উঠিলে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ভুবনরূপ উদ্যানের উল্লেখে ঠাকুরদাদা মহাশয় যে সু-খের কথা কহিয়াছেন, তাহা বড় উত্তম বোধ হয় না, আমার বিবেচনায় তথাকার মনুষ্যেরা উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

ক্রমে তাঁহার সতের বৎসর বয়স হইল, এতাবৎ কাল দিবারাত্রি সেই উদ্যানের বিষয় আন্দোলন করিয়া তিনি কালযাপন করিয়া ছিলেন। নিরন্তর একাকী থাকিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন, অতএব এক দিন সম বয়স্ক বন্ধু অথবা কোন ভৃত্যকে সঙ্গে না লইয়া একাই অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে যান। ভ্রমণ করিতে২ দিবাবসান কালে শূন্যমার্গ মেঘ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এত বৃষ্টি বর্ষণ

করিল যে, রাজকুমার বোধ করিলেন, আকাশ বুঝি বড় একটা পয়নালার মত হইয়া এত জল ঢালিতেছে। বৃষ্টি-কালীন চরাচর যেরূপ অন্ধকার হইয়া থাকে, তদপেক্ষাও ঘোর অন্ধকার হইল। বোধ হয় রাত্রিতেও এত অন্ধকার হয় না, অতি গভীর কূপের নিম্নভাগে ইহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকার আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। রাজকুমার সাহস পূর্ব্বক পা উঠাইতে পারেন না, উঠাইলেই তাহা ভিজ্যা ঘাসে লাগিয়া হয়তো পিছলিয়া পড়িয়া যান, নতুবা উচট্ খাইয়া কোন শৈলের উপর পড়েন। জল বিন্দু দ্বারা সকলই সিক্ত হইয়া গিয়াছে, রাজনন্দনের অঙ্গোপরি এক খানিও শুষ্ক বস্ত্র নাই। কি করেন, ঘোর অন্ধকার, কিছু দেখিবারও উপায় নাই, যাইতে যাইতে অতি প্রকাণ্ড এক খান প্রস্তর অনুভব হইলে তাঁহাকে তাহারই উপর আরোহণ করিতে হইল, কিন্তু সেই প্রস্তরের উপরিভাগে বিস্তর শৈবাল উৎপন্ন হওয়াতে তন্নিঃসৃত বৃষ্টি সকল স্রোতোবৎ সেই প্রস্তর দিয়া পতিত হইতে ছিল। রাজকুমার এই দারুণ কষ্টে অতি ক্ষীণ-বল হইয়া প্রায় মূর্চ্ছাপন্ন হয়েন, এমত সময়ে এক আশ্চর্য্য কর্কশ শব্দ তাঁহর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, ইহাতে চমৎকৃত হইয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে একটা পর্ব্বত গহ্বর দেখিলেন। উহার মধ্য স্থলে ভারি একটা অগ্নি জ্বলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ রাশির দ্বারা ঐ অগ্নির শিখা এমত বলবতী যে তাহাতে একটা

হরিণ ফেলিয়া দিলেও ক্ষণমাত্রে তাহা ভস্মসাৎ হইয়া যায়। রাজকুমার ঐ পর্ব্বত গহ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখেন, পূর্ব্বে যে বিষয়টি তিনি অনুভব করিয়া ছিলেন, তাহা যথার্থই হইল। শৃঙ্গ প্রশৃঙ্গযুক্ত একটা অতি সুন্দর হরিণ লৌহ শলাকাতে বিদ্ধ হইয়া সেই অগ্নির উপরিভাগে সিদ্ধ হইতেছে, এক ব্যক্তি বড় বড় দেব-দারু কাষ্ঠের দুই খান গুঁড়ি লইয়া আস্তে আস্তে তাহা এপিঠ ওপিঠ নাড়িয়া দিতেছে। রাজকুমার উত্তমরূপে দৃষ্টি করিয়া অনুভব করিলেন পূর্ব্বে যাহাকে তাঁহার পুরুষ বোধ হইয়াছিল, সে পুরুষ নয়, এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তাহার হাত পা গাত্রের অস্থি পর্য্যন্ত সকলই পুরুষের ন্যায়, কেবল স্ত্রীলোকের মত বস্ত্র পরিধান করিয়া অগ্নির সন্নিহিত স্থানে উপবেশন করতঃ এক এক খান গুঁড়ি কাষ্ঠ তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে।

রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া ঐ কুৎসিতা নারী দয়ালুভাবে বলিতে লাগিল, এই অগ্নির নিকটে বসিয়া তুমি আপন বস্ত্র গুলিন শুষ্ক করিয়া ফেল। রাজকুমার মৃত্তিকার উপর বসিয়া ঐ স্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন উঃ এখানে কি শীত বোধ হইতেছে! তাহাতে ঐ স্ত্রী উত্তর করিল, "তথাচ আমার পুত্রেরা এখন ঘরে আইসে নাই, তাহারা গৃহে আগমন করিলে আরওত মন্দ হইবার সম্ভাবনা আছে। আকাশ-বায়ু নামে আমার চারি পুত্র, এই পর্ব্বত গহ্বর তাহাদিগেরই বসতি স্থান, আপনি

তাহারই মধ্যে বসিয়া আছেন, বুঝিলেন কি না”; রাজ নন্দন বলিলেন, ভাল তবে তোমার পুত্রেরা এক্ষণে কোথায়? । “স্ত্রীলোক বলিল এ বড় নির্ব্বোধের কথা তাহারা যে যার নিজ নিজ কর্ম্ম করিতেছে। অঙ্গুলী দ্বারা শূন্যমার্গ দেখাইয়া কহিল ঐ যে মেঘের উপর ইন্দ্র ভবন দেখিতেছ, ঐ মেঘে তাহারা আপনাপন মাকুচালাই- বাতে এত বৃষ্টি বর্ষণ হইল”। রাজপুত্র কহিলেন হাঁ বটে, কিন্তু তুমি বড় কর্কশ কথা কহ, তোমার কথায় কিছুমাত্র রস নাই, পূর্ব্বে আমি যত স্ত্রীলোককে দেখি- য়াছি কেহই তোমার মত অশ্লীল ভাষা কহে না, তাহারা মৃদুভাবে কথা কহিয়া লোকদিগের মনোরঞ্জন করে।

এই কথাতে ঐ বৃদ্ধা কহিতে লাগিল, তুমি যে স্ত্রীদি- গের কথা আমার কাছে বলিতেছ, তাহাদিগকে কিছুই করিতে হয় না, আমার পুত্র গুলির উচক্কা বয়স, অতি অবাধ্য, তাহাদিগকে সুনিয়মে রাখিবার নিমিত্ত অবশ্যই আমাকে কর্কশ কথা ব্যবহার করিতে হয়, না করিলে কোন মতেই আমি তাহাদিগকে বশীভূত ক- রিতে পারি না। ঐ দেখ দেওয়ালের উপর চারিটা থলিয়া ঝুলান আছে। তুমি যেমন বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের হস্তে বেত্র দেখিয়া মনে মনে বড় ভয় পাইতে, তাহারাও ঐ চারিটি থলিয়া দেখিয়া সেই রূপ অতিশয় ভীত হয়। তাহারা আমার কথা না শুনিলেই তাহা- দিগকে মুড়ে গুড়ে হেট মাথা করাইয়া একেবারে একটা

থলিয়ার ভিতর প্রবেশ করাইয়াদি, তাহাতে সম্মতই হউক বা অসম্মতই হউক একটি মাত্র কথা বলিতে দিই না। যতক্ষণ আমি তাহাদিগকে বাহির হইতে আজ্ঞা না করি ততক্ষণ তাহারা সাহস করিয়া বাহির হইতে পারে না, উহারই ভিতরে থাকিতে হয়। ঐ দেখ তাহাদের এক জন আসিতেছে। উহার নাম উত্তর বায়ু। উত্তর বায়ু গৃহে প্রবেশ করিলে চতুর্দ্দিকটা বরফের মত শীতল হইয়া উঠিল। মেঝ্যার মধ্যে কতই শিলাবৃষ্টি হইল তাহা গণনা করা যায় না, হিমানি সকল চারিদিকে বিস্তারিত হইল। নিকটস্থ হইলে রাজপুত্র দেখিতে পাইলেন যে সে এক খান ভল্লূকের চর্ম্ম পরিধান করিয়া রহিয়াছে, মাথায় তিমি মৎস্যের চামড়ার টুপি, কাণ পর্য্যন্ত তাহা ঢাকিয়া পড়িয়াছে, জল জমাট হইয়া বরফের বিন্দু সকল তাহার দাড়ির উপরে ঝুলিতেছে, তাহার পরিধেয়ের ফুঁপি হইতে এক একটা শিল পড়িতেছে।

রাজপুত্র উত্তর বায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমার আগমনে পর্ব্বত গহ্বরে সাতিশয় শীতানুভব হইতেছে, তুমি আর কিছু কাল উত্তর সমুদ্রের নিকট থাকিলে, তোমার মুখ হাত সকলই বরফ দ্বারা জমাট হইয়া যাইত। উত্তর বায়ু খল খল করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল জমাট হইয়া যাইবে কেন? শীতলতাতেই আমার বড় আনন্দ! তুমি এ প্রকার ক্ষুদ্র জীব, এই বায়ুদিগের গহ্বরে তুমি কেমন করিয়া আইলে?।

বৃদ্ধা স্ত্রী উত্তর করিল "ইনি আমার বাটীতে অতিথি হইয়াছেন, এখন বুঝিয়াছ কি না? যদি এ কথাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আর কোন কথা বল, তবে এখনই তোমাকে ঐ থলিয়ার ভিতরে পুরিব"। মাতৃ উক্তি শ্রবণ করিয়া উত্তর বায়ু আর কোন কথা রাজকুমারকে প্রশ্ন করিল না, একেবারে নিরস্ত হইয়া মাসাবধি কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছে, এতাবৎ বৃত্তান্তই মাতৃ আজ্ঞায় বর্ণনা করিতে লাগিল।

উত্তর বায়ু কহিল। আমি রুষিয়া দেশীয় সমুদ্রগাভী* শিকারী লোকদিগের সহিত উত্তর সমুদ্রের ভল্লূক উপদ্বীপে গিয়া ছিলাম, এক্ষণে সেই উত্তর সমুদ্র হইতে বাটী আসিতেছি। তাহারা উত্তর অন্তরীপ পরিত্যাগ করিয়া যখন জাহাজ চালাইয়া যায়, আমি উহার হাইলের উপর নিদ্রা যাইতে ছিলাম, এক এক বার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্র পক্ষী সকল আমার পায়ের নীচে দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। কি আশ্চর্য্য কৌতুক! ঐ পক্ষীরা এক বার পাখা ঝট্ পট্ করিয়া সাঁই সাঁই

---

* সমুদ্র-গাভী এক প্রকার পশু বিশেষ, শিকারী লোকেরা উত্তর সমুদ্রে গমন করিয়া ঐ জন্তুকে শিকার করে; উহার চর্ব্বি এবং চর্ম্ম অতিশয় কার্য্যকারক। হস্তীদন্তের ন্যায় উহার বড় বড় দুই দন্ত আছে, তাহাতে নানা প্রকার কর্ম্মণ্য বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ পশু আকার প্রকারে গাভীর মত নহে, শুদ্ধ সমুদ্র তটে নিরন্তর থাকে বলিয়া লোকে তাহাদিগকে সমুদ্র-গাভী বলে।

করিয়া যায়, পরক্ষণেই আর কিছুমাত্র যাইতে পারে না, স্থির ভাবে পড়িয়া থাকে, যেন তাহারা অধিক উড়িয়া বড় শ্রান্ত হইয়াছে।

বায়ুদিগের মাতা কহিল, এত বিস্তার করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই, যে মতে তুমি উত্তর সমুদ্রের সেই উপদ্বীপে পৌঁছিলে তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইল। তারপর কি? উত্তর বায়ু বলিল আহা! ভল্লূকদ্বীপ কি রম্য স্থান, তথাকার ভোজন ও শয়ন গৃহ প্রভৃতি সকলই বাসনের মত চিক্কন, অর্দ্ধ গলিত তুষার সকল অল্প অল্প শৈবাল দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রাশি রাশি পড়িয়া রহিয়াছে, তীক্ষ্ণ প্রস্তর এবং সমুদ্র-গাভী ও ভল্লূকদিগের কত অস্থি সে স্থানে রহিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না, আর দেখিলাম ভয়ানক রাক্ষসদেরও হস্ত পদাদি সকল সেই স্থানে আছে, বড় একটা ক্ষয় হয় নাই। ইহাতে আমার বোধ হইল সূর্য্য বুঝি উদয় হইয়া সেখানে কিছুমাত্র কিরণ প্রদান করেন না। কোয়াসা দ্বারা শূন্যমার্গ আচ্ছন্ন রহিয়াছে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এজন্য আমি অল্প অল্প বাতাস দিতে লাগিলাম যেন কুঁড়িয়া ঘর সকল উত্তমরূপে আমার দৃষ্টিগোচর হয়। যে সকল জাহাজ চড়ায় লাগিয়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তত্রস্থ লোকেরা সেই জাহাজের ভগ্ন তক্তায় আপনাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ গুলীন নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সমুদ্র গাভীর চর্ম্ম দ্বারা তাহার উপরিভাগ আচ্ছাদিত হয়, ইহা আমার বিশেষ উপলব্ধি হইল।

যে দিকে গাভীদিগের লোম থাকে সেই দিকটা ভিতরে এবং মাংসল দিকটা বাহিরে থাকাতে আমি উত্তমরূপে অনুভব করিলাম যে তাহা রক্ত এবং হরিদ্বর্ণ। আর একটা সজীব ভল্লূক উহার চালের উপর বসিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। আমি সমুদ্র তীরে গমন করিয়া পক্ষী সকলের বাসাগুলীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম যে, তন্মধ্যে গোড়িম—কিছুমাত্র পালক উঠে নাই, এমত সহস্র সহস্র পক্ষীশাবক আপনাদিগের চঞ্চু ব্যাদান করিয়া চীৎকার করিতেছে; তাহাদের কণ্ঠদেশে আমি বায়ু সঞ্চালন করাতেই তাহারা ঠোঁট গুলীন বন্ধ করিল। আর কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি শূকরদিগের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীট উড়িয়া বেড়ায়, সমুদ্র-গাভী সকল সেই রূপ পালে পালে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের দন্ত গুলীন দুই দুই হাত লম্বা।

মাতা বলিল, ভাল আমার ধনমণি! তুমি নিজকৃত কর্ম্ম সকল বেশ্ মনোহর রূপে বলিলে, তোমার কথা শুনিয়া আমার মুখ হইতে জল সরিতেছে। ভাল তার পর কি? পুত্র কহিল, অপর শিকারী লোকেরা শিকার করিতে আরম্ভ করিয়া টেঁটা দ্বারা সমুদ্র-গাভীদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল, পর্ব্বতস্থ উৎস হইতে যেরূপ নির্ঝর নির্গত হয়, উহাদের বক্ষস্থল হইতে ফিনিক দিয়া সেইরূপ রুধির বহির্গত হওয়াতে তত্রস্থ বরফ সকল একেবারে রক্তাক্ত হইয়া গেল। তখন আমাকে ঐ শিকার বিষয়ে কি করিতে

হইবে, এই বিবেচনা করিয়া আমি বায়ু সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলাম, জলোপরি এক এক স্থানে যে চাপ চাপ বরফ থাকে সেই আমার নৌকা স্বরূপ হইল, সঞ্চালিত বাতাস পাইয়া উহা সোঁ সোঁ শব্দে ঠিক্ সোজা ঐ শিকারীদের নৌকায় আসিয়া লাগিল। ঘোরতর শব্দে বাতাস আসিতেছে দেখিয়া তাহারা কতই চীৎকার করিল, উহারা যত চেঁচায় আমিও তত হুহু শব্দে বায়ু সঞ্চালন করি। কি করিবে শিকারী লোকেরা ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না, পূর্ব্বে যে সকল সমুদ্র-গাভীকে নষ্ট করিয়া তাহাদের মৃত শরীরকে এক স্থানে বন্ধন করিয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল বন্ধন গুলীন বিমোচন করিয়া পাছে জাহাজ ভারী হয়, এজন্য ঐ জন্তু সকল ও আপনাদিগের আর আর জিনিশপত্র সকলই ঐ জাহাজ হইতে নামাইল। এমত সময়ে আমি বায়ুভরে হিমানী লইয়া তাহাদের মস্তকে নিক্ষেপ করিলাম এবং এমত বাতাস চালাইলাম যে আর তাহারা স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, জাহাজ এবং শিকার উভয়কেই দক্ষিণ সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে হইল, এক্ষণে সেই শিকারী লোকেরা দক্ষিণ সমুদ্রের লোণা জল পান করিয়া মরিতেছে, বোধ করি তাহারা ভল্লূক দ্বীপে আর কখন প্রত্যাগমন করিবে না।

বায়ুদিগের মাতা কহিল, অরে দুষ্ট বালক! তুমি পরের অহিত করিয়াছ। মাতৃ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর বায়ু

কহিল, মা আমাকে এমন কথা কখনই বলিবেন না, আমি যত পরের হিত করি অন্যেরা তাহা জানে। এমত সময়ে পশ্চিম দিক হইতে তাহার আর এক ভ্রাতা আইল, সে ওষ্ঠাধরের দ্বারা সমুদ্রের ন্যায় শব্দ করিয়া থাকে,এবং আসিবার কালীনও সামুদ্রীয় শীতলতাকে সঙ্গে করিয়া আনে। উত্তর বায়ু কহিল ঐ আমার ভ্রাতা আসিতেছে, আমি উহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি। রাজপুত্র কহিলেন উহার নাম অল্প বয়স্ক পশ্চিম বায়ু না কি? বৃদ্ধা কহিল হাঁ উহারই নাম পশ্চিম বায়ু, কিন্তু তুমি যে উহাকে অল্প বয়স্ক কহিলে ও তো অল্প বয়স্ক নহে, অনেক দিন হইল, ও এক অতি সুন্দর ছোট বালক ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহা গত হইয়া গিয়াছে, উহার যুবকাল উপস্থিত। পশ্চিম বায়ু দেখিতে বড় সুন্দর পুরুষ নহে, অতি কদাকার ঠিক একটা বনমানুষের মত। যেন কোন আঘাত না পায় এজন্য তাহার গলদেশে মস্ত একটা নোড়া ঝুলিতেছিল, তাহার হস্তে এক গাছা হোগ্নি কাষ্ঠের লাঠী, আমেরিকা দেশের অরণ্য মধ্যে হোগ্নি কাষ্ঠ জন্মে সেই স্থানেই সে গমন করিয়া ঐ কাষ্ঠের একটা লাঠী ছেদন করিয়া আনে, লাঠী গাছটী বড় অল্প ভারী ছিল না। মাতা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ? তা বল, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

পশ্চিম বায়ু কহিল, মাতঃ আমি একটা নিবিড় অরণ্য মধ্যে গিয়া ছিলাম, সেখান কার তৃণ সকল অতি দীর্ঘ,

প্রত্যেক বৃক্ষের মধ্য স্থলে তাহারা উৎপন্ন হইয়া ঘাসে ঘাসে পেঁচ লাগিয়া এমনি দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছে যে দেখিলেই একটা বেড়ার মত বোধ হয়, তথায় বড় বড় জল ঢোঁড়া সাপ সকল ভিজ্যা ঘাসের মধ্যে শুইয়া থাকে, তাহাতেই অনুমান করি, সেখানে মনুষ্যজাতি কোন কার্য্যকারক নহে। মাতা কহিলেন তুমি এত দিন সেখানে কি করিতে ছিলে?

প্রত্যুত্তর প্রদানে পশ্চিম বায়ু কহিল " কেন, কত বস্তু দেখিয়াছি, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না, একটা গভীর নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া পতিত হইয়াছে, তাহার ঝরণা পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে তাহা ধূলার ন্যায় হইয়া শূন্য মার্গে যেন রামধনুক পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে এমত বিবেচনা হইল, আর একটা মহিষ নদী দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতে যাইতে তরঙ্গ মধ্যে ভাসিয়া গিয়া এক পাল বন্য হংসের সহিত মিলিল, হংসগণ জল মধ্যে তাহার ধাক্কা খাইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইল। দুর্ব্বল মহিষ প্রাণ ভয়ে এক গড়ানিয়া স্থানে উঠিতে ছিল বটে, কিন্তু উঠিতে উঠিতে অধঃপতিত হইলে তাহার তাবৎ শরীরটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া এমনি একটা ঝড় উঠাইলাম যে অতি প্রাচীন প্রকাণ্ড২ বৃক্ষগণও চূর্ণ হইয়া নদীর স্রোতে পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল"।

বৃদ্ধা স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ইহা ভিন্ন আর কিছুই কি কর নাই? পশ্চিম বায়ু উত্তর করিল, "কেন, তৃণবিহীন মাঠে গিয়া আমি কত লক্ষ ঝম্ফ দিয়াছি, সেখানে কত বন্য ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়াছি, তাহা গণনা করা যায় না। শত শত নারিকেল গাছ আমার বাতাসে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মা! আমার বিস্তর কথা বলিতে আছে, কিন্তু যাহা জানি সমুদায় কথা একেবারে বলা কোন প্রকারে উচিত নয়"। ইহা বলিয়া সে এমনি অসভ্য রূপে তাহার মাতার গলদেশ জড়িয়া ধরিল যে সে উলটিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। তদ্দর্শনে ঐ যুবা অতিথি মনে২ বিবেচনা করিলেন, এমন আশ্চর্য্য অসভ্য বালক কেহ কখন দেখে নাই।

এমত সময়ে দক্ষিণ বায়ু গায়ে এক খানি রেজাই এবং মস্তকে একটি পাগড়ী পরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া সে বলিতে লাগিল, উঃ এখানে আসিয়া আমাকে বড় শীত লাগিতেছে, ইহাতেই বোধ হয় বুঝি উত্তর বায়ু ভ্রাতা আমার অগ্রে আসিয়া থাকিবে। উত্তর বায়ু সহাস্য মুখে বলিল, হাঁ বেশ উত্তাপ আছে, কোন উত্তর দেশীয় ভালুক এই অগ্নি মধ্যে ফেলিয়া দিলেই সিদ্ধ হইয়া যায়। দক্ষিণ বায়ু উত্তর করিল, তুমি নিজেই ভালুক আবার ভালুকের কথা কি বলিতেছ।

বৃদ্ধা স্ত্রী এই কথাতে কিছু রাগান্বিতা হইয়া কহিল,

আমি তোদের দুই জনকেই ঐ থলিয়ার ভিতরে পুরিব, মনে আছে কি না, চুপ করে ঐ পাথর খানার উপরে বস্, এবং কোথায় গিয়াছিলি তা বল্।

মায়ের ভয়ে দক্ষিণ বায়ু কিছু শান্ত হইয়া বলিতে লাগিল, আমি আফ্রিকা দেশীয় হাপসী লোকদের সঙ্গে ক্যাফ্রেরিয়া দেশে সিংহ মারিতে গিয়াছিলাম, সেখানকার ময়দানে যে তৃণাদি উৎপন্ন হয়, তাহা জলপাই বৃক্ষের মত সবুজ বর্ণ। একটা উষ্ট্র আমার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া ছিল, কিন্তু আমি তাহার অপেক্ষাও শীঘ্র গিয়াছিলাম; পরে ঐ মরু ভূমিস্থ পীতবর্ণ বালুকা মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখি, ঠিক্ তাহা সমুদ্র জলের ন্যায় দেখাইতেছে। তথায় এক দল যাত্রী কিছু জল পাইবার প্রত্যাশায় একটা উষ্ট্র মারিয়া ফেলিল*, কিন্তু

* আফ্রিকা দেশের অনেক অংশ শুষ্ক বালুকাময় স্থান, তথায় তৃণ বৃক্ষ সরোবরাদি কিছুমাত্র নাই। বোঝা বহিবার জন্য, দুঃখ সহিষ্ণু উষ্ট্রজন্তুরাই কেবল সেই স্থানের পক্ষে উপযুক্ত; কারণ তাহারা জলপান না করিয়াও মাসাবধি জীবিত থাকিতে পারে। তাহাদিগের উদরের মধ্যে কয়েকটা বারিরক্ষণী স্থলী আছে, কোন স্থানে একবার জল পাইলে কিয়দ্দিনের নিমিত্ত তাহারা ঐ স্থলীতে একেবারে জল পরিপূর্ণ করিয়া লয় এবং আবশ্যক মতে তৃষ্ণা নিবারণ করে। ঐ ভয়ানক মরুভূমিতে ভ্রমণকারী লোকেরা জলাভাবে যখন নিতান্তই প্রাণরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, তখন উষ্ট্র বিনাশপূর্ব্বক তাহার উদরস্থ জল পান করিয়া জীবন রক্ষা করে।

বড় একটা জল পাইল না; অতি অল্প জলই পাইল। উপরে সূর্য্যের কিরণ এমনি প্রখর যে মাথা জ্বলিয়া যায়, এবং নীচে বালুকা এমনি উষ্ণ যে তাহাতে পা দিবারও যো নাই। সেই মরুভূমি কত দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহার সীমা করা যায় না। আমি তন্মধ্যস্থ অতি সূক্ষ্ম ঝরঝরিয়া বালুকাতে ঘুর পাক দিয়া বাতাস দিতে লাগিলাম, তাহাতেই তাহা বড় বড় স্তম্ভের মত হইয়া উঠিল। যে যে ব্যবসায়ী লোকেরা ঐ স্থান দিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতে ছিল, বালুকা ভয়ে আর তাহারা যাইতে পারিল না, বড় বড় চাদর আনাইয়া আপনাদের মস্তকে ঢাকা দিল, উষ্ট্রগুলা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, আমিও তত বালুকাস্তম্ভে বায়ু সঞ্চালন করিয়া তাহা নাচাইতে আরম্ভ করিলাম। মা! তুমি তাহা দেখিলে নাজানি কত খুসি হইতে! ঐ বণিকেরা জাতিতে মুসলমান, আল্লা নামক ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহারা যেরূপ প্রণিপাত করে, আমাকেও তাহারা সেই রূপ অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এক্ষণে তাহারা সেই বালুকা স্তম্ভের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে, আমি বায়ু সংযোগে সেই বালুকা রাশি উড়াইয়া দিলেই সূর্য্যদেব উত্তপ্ত কিরণ দ্বারা তাহাদের চর্ম্মাচ্ছাদিত অস্থি সকলকে শ্বেতবর্ণ করিয়া ফেলিবেন, তাহা দেখিয়া পরিব্রাজক লোকেরা অনুমান করিতে পারিবে যে আমাদের পুর্ব্বেও এখানে অনেক লোক আসিয়াছে। কেন না স্পষ্ট প্রমা-

ণের অভাবে কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করে না যে, আমার পুর্ব্বে এই আফ্রিকা দেশীয় মরুভূমিতে আর কোন লোক আসিয়াছিল।

দক্ষিণ বায়ুর কথা শুনিয়া ক্রোধভাবে তাহার মাতা কহিল, তুমি অন্যের হিংসা ব্যতিরেকে আর কোন কর্ম্মই কর নাই, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, ঐ থলিয়ার ভিতরে যাও। ইহা বলিয়া বৃদ্ধা তাহার কোমর ধরিল এবং টের না পাইতে পাইতে একেবারে সেই থলিয়ার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। দক্ষিণ বায়ু থলিয়ার ভিতর থাকিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমির উপর ছট্ ফট্ করিবাতে বায়ুদিগের মাতা তাহার উপরে গিয়া বসিল, ইহাতেই সে নিরস্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাজকুমার কহিলেন ওগো বৃদ্ধে! তোমার সকল সন্তানগুলিকে আমি তেজস্বী দেখিতেছি।

সে উত্তর করিল, হাঁ বটে, কিন্তু কি প্রকারে তাহাদিগকে দমনে রাখিতে হয় আমি তাহা ভালরূপ জানি, ঐ দেখ আমার চতুর্থ পুত্র আসিতেছে। ইহার নাম পুর্ব্ববায়ু। চীন দেশীয় লোকেরা যে প্রকার বস্ত্র পরিধান করে, পুর্ব্ববায়ু সেই প্রকার কাপড় পরিয়া আইল।

বায়ুদিগের মাতা তাহাকে চিন লোকের ন্যায় পরিচ্ছদ পরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বুঝি তুমি চীন দেশে গিয়াছিলে, কাল বিলম্ব হওয়াতে আমি অনুমান করিয়াছিলাম তুমি ভুবনরূপ উদ্যানে গিয়াছ। পুর্ব্ববায়ু

বলিল "মা! কল্য আমি সেখানে যাইব, শত বৎসরের পরে আমি একবার কেবল ভুবনরূপ উদ্যানে গিয়া থাকি, অদ্য রাত্রি অবসানে কল্য শত বৎসর সমাপ্তি হইতে পারিবে। এক্ষণে আমি চীনদেশ হইতে আসিতেছি, সেখানে স্তম্ভের ভিতরে এক একটি অতি সুন্দর ঘণ্টা টাঙান আছে, আমি গিয়া সেই স্তম্ভের উপরি ভাগে উ-ঠিয়া বায়ুভরে নৃত্য করিতে লাগিলাম, তাহাতে তন্মধ্যস্থ ঘণ্টাগুলান ঠন্ ঠন্ শব্দে বাজিতে লাগিল। সেখান-কার রাজকর্ম্মকারকদের এক একটি উপাধি আছে। তাহারা কেহ প্রথম কেহ দ্বিতীয় কেহ তৃতীয় ইত্যাদি সপ্তম অষ্টম নবম প্রভৃতি উপাধি দ্বারা বিখ্যাত হয়। দেখিলাম ঐ রাজ ভৃত্যদের মধ্যে কেহ কেহ চৌমাথা পথের মোয়াড়ায় দণ্ডায়মান হইয়া রাজাজ্ঞায় শাস্তি পাইতেছে, মারের চোটে তাহারা ভীত হইয়া মহারা-জকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক বলিতেছে হে মহারাজ! আপনি আমাদের পিতার ন্যায় হিত কারক, কিন্তু ইহা যে তাহা-দের মনোগত কথা নহে তাহা আমি উত্তমরূপে জানি। অতএব ঘণ্টাধ্বনি করিয়া না, না, না, না, তা, না, না, না, ইত্যাদি বহুবিধ গীত গাইতে লাগিলাম"।

বৃদ্ধা স্ত্রী কহিল, "যাহাহউক বাছা তুমি দুষ্টস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। কল্য ভুবনরূপ উদ্যানে যাওয়া তোমার পক্ষে বড় ভাল, তাহাতে তোমার জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে। শুন বাছা, সেখানে জ্ঞানরূপ বারির একটি উৎস আছে, যত

তাহার জল পান করিবে তুমি ততই জ্ঞানী হইবে, অতএব সেই জল প্রচুররূপে পান করিও এবং আসিবার কালীন আমার নিমিত্তে একটি ক্ষুদ্র থালি ভরিয়া আনিবে, দেখ ধন যেন এই কথাটির অন্যথা না হয়, ভাল করিয়া মনে রাখ”।

পূর্ব্ববায়ু কহিল “হাঁ মা! আপনি ইহাতে উৎকণ্ঠিতা হইবেন না, কল্যই আমি সেখানে গিয়া আপনকার মানস সিদ্ধ করিব, কিন্তু আমার একটি বিষয় প্রার্থনা আছে, আপনি কি জন্য আমার দক্ষিণবায়ু ভ্রাতাকে ঐ থলিয়ার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, উহাকে আমার বড় প্রয়োজন আছে, অতএব অনুগ্রহ পুর্ব্বক উহাকে ছাড়িয়া দেউন। ভুবনরূপ উদ্যানের মধ্যে এক রাজ-কন্যা থাকেন; শত বৎসরান্তর তাঁহার সহিত এক এক বার সাক্ষাৎ হইলেই তিনি আমাকে হোমা পক্ষীদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, মা! ঐ পক্ষীদের এক আশ্চর্য্য স্বভাব আছে, অগ্নি দ্বারা তাহারা ভস্মসাৎ হইলেও পুনর্জ্জীবিত হয়। ওগো মা! দক্ষিণবায়ু ভ্রাতা ঐ হোমার বিষয় উত্তমরূপে জানেন, দাও মা! দয়া করিয়া ঐ থলি-য়াটির মুখ বন্ধ খুলিয়া দাও। আপনি বেশ জানেন আমি চীনদেশে গিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে আসিবার কালীন উত্তম দুই পোঁটলা চা* আনিয়াছি দাদা ভাইকে ছাড়িয়া দিলেই আমি ঐ চা তোমাকে দিব”।

---

* চা এক প্রকার বৃক্ষের পত্র, ইউরোপীয় লোকেরা শীত নিবারণ হেতু উষ্ণ জলে ঐ পত্র নিক্ষেপ করিয়া চিনি এবং দুগ্ধ

"মাতা বলিল, ভাল, বাছা! তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি, আবার চায় কথা বলিতেছ, এ কারণ আমি ঐ থলিয়াটির মুখবন্ধন খুলিয়া দিব ভাবনা করিও না।"

তদনুসারে মাতা থলিয়ার মুখবন্ধন খুলিয়া দিলে দক্ষিণবায়ু পাগলের মত তাহার ভিতর হইতে বহির্গত হইল, মুখে বাক্য মাত্র নাই, অতিশয় লজ্জাতে সে একেবারে অধোবদন করিল, কেন না বিদেশীয় রাজপুত্র স্বচক্ষে তাহার অপমান দেখিয়াছিলেন।

দক্ষিণবায়ু তখন বলিতে লাগিল, এই বিস্তারিত জগতের মধ্যে কেবল একটি মাত্র ফিনিক্স অর্থাৎ হোমা পক্ষী আছে ঐ যে তালপাতাটি দেখিতেছ, আসিবার কালীন সেই পক্ষী আমাকে ঐ পত্রটি দেয়, উহাতে তাহার জীবন-বৃত্তান্ত সমুদায় লেখা আছে, শত বৎসরের অধিক তাহার পরমায়ু হয় না, সে চঞ্চুদ্বারা জীবন কালের তাবৎ বিবরণ ঐ পত্র মধ্যে লিখিয়াছে। রাজকুমারী এই পত্র পাঠ করিলেই যে রূপে হোমা পক্ষী ভারতবর্ষীয় বিধবাদিগের ন্যায় আপন নীড় মধ্যে অগ্নি লাগাইয়া বসিয়া থাকে, শুষ্ক পত্র গুলীন প্রজ্জ্বলিত হইলে যেরূপ কট্‌ কট্‌ শব্দ করে, যেরূপে ইহার ধূম সকল শূন্যমার্গ

সংযোগে সেই জল পান করেন। এক্ষণে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরাও তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চিকিৎসকদিগের মতে উষ্ণতা ব্যতীত চা সেবনে আরও অনেক উপকার হয়।

পর্য্যন্ত উঠে,সে সকলই পড়িতে পারিবেন। আরও ইহাতে লেখা আছে যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইলে ফিনিক্স পক্ষী তৎসহকারে একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, কেবল তাহাতে অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত একটি ডিম্বমাত্র থাকে, ক্ষণকাল পরে অতি ঘোরতর শব্দে ঐ অণ্ডটা ফাটিয়া গেলেই তন্মধ্য হইতে একটি পক্ষিশাবক বহির্গত হইয়া উড়িয়া যায়। সম্প্রতি ঐ পক্ষিশাবক পৃথিবী তলে সকল পক্ষীর রাজাস্বরূপ হইয়া কেবল একমাত্র রহিয়াছে। এই যে পত্রটি আমি তোমাকে দিলাম, ইহাতে সে চঞ্চুদ্বারা একটি গর্ত্ত করিয়া রাজকন্যার সমীপে আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

অপর বায়ুদিগের মাতা কহিলেন, অধিক রাত্রি হইয়াছে, আইস আমরা এক্ষণে কিছু আহার করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করি। ইহা বলিবামাত্র সকলেই তাহারা একত্রে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত পোড়া হরিণকে ভোজন করিতে লাগিল। রাজপুত্র পূর্ব্ববায়ুর নিকটে বসিয়া আহার করিতে ছিলেন, একারণ দুই জনে কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ের মধ্যে অতিশয় প্রীতি জন্মিল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! তুমি যে রাজকন্যার কথা বলিতেছ তিনি কেমন? আর ভুবনরূপ উদ্যানই বা কোথায় আছে? অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।

পূর্ব্ববায়ু হোঃ হোঃ শব্দে হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল,

সেখানে যাইতে কি তুমি মানস করিয়াছ, থাকেতো বল, কল্য প্রাতঃকালে উড্ডীয়মান হইয়া যখন আমি সে-খানে যাইব তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইও। কিন্তু একটি কথা বলি ভাই মনে রাখ, মানব জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তিই পুর্ব্বে ঐ স্থান কখন দর্শন করে নাই। পরিদের যে রাণী আছেন, উহা সেই রাণীরই বসতি স্থান। তন্মধ্যস্থ অখাত মধ্যে যে একটি উপদ্বীপ আছে তাহার নাম সুখময় উপদ্বীপ, এমন মনোহর স্থান তুমি কখন দর্শন কর নাই, মৃত্যুরও সাধ্য নাই যে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আপন পরাক্রম প্রকাশ করে। কল্য তুমি আমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিলে বোধ করি আমি তোমাকে লইয়া সেখানে যাইতে পারিব। অধিক রাত্রি হইয়াছে অদ্য আর কথাবার্ত্তার আবশ্যক নাই। এক্ষণে আমি শয়ন করিতে চাহি। অপর সক-লেই তাহারা শয়ন করিতে গেল।

পরদিন প্রত্যুষে রাজকুমার গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন যে, তিনি আর পর্ব্বত গহ্বরে নাই, পুর্ব্ববায়ু তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া একেবারে মেঘের উপরিস্থিত শূন্যমার্গে তুলিয়াছে, জন্মাবধি এত ঊর্দ্ধে তিনি কখন উত্থিত হন নাই, অধস্থিত বন ময়দান নদী এবং ঝীল সকল একখানি বিচিত্র বর্ণের নক্সার ন্যায় দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পাছে রাজকুমার অধঃপতিত হন, এজন্য পুর্ব্ববায়ু তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়াছিল।

পূর্ব্ববায়ু রাজপুত্রকে জাগরূক দেখিয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "আপনি এত শীঘ্রই উঠিয়াছেন, আর একটু নিদ্রা যাইলে ভাল হইত, যে সুবিস্তীর্ণ দেশ সকল আমরা পার হইয়া যাইতেছি, তন্মধ্যে দেখিবার যোগ্য কোন বস্তুই নাই, কেবল সবুজ তক্তাতে চুনের ফোঁটা লাগাইলে যেরূপ দেখা যায়, এই দেশস্থ মন্দির সকল সেই রূপ দেখাইতেছে"। বোধ হয় ক্ষেত্র এবং ময়দান সকলকে পূর্ব্ববায়ু এস্থানে সবুজ তক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে।

তখন রাজনন্দন পূর্ব্ববায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আমি আসিবার সময়ে তোমার মাতা এবং আর আর ভ্রাতাদিগকে কহিয়া আসি নাই, এ কর্ম্মটি বড় ভাল হয় নাই, অতিশয় অভদ্রের কার্য্য হই-য়াছে"।

পূর্ব্ববায়ু প্রতিবচন করিল, "এ আর অভদ্রতা কি। মনুষ্য নিদ্রাবস্থায় থাকিলে অবশ্যই তাহার ওজর চলিতে পারে, তার জন্যে তুমি এত দুঃখ করিও না"।

অপর তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে উড়িয়া যাইতে লাগিল, যাইতে যাইতে বৃক্ষ সকল তাহাদের অধোভাগে থাকিয়া প্রবল পরাক্রমশালী পূর্ব্ববায়ুর প্রতাপ হেতু আপনাদিগের শাখা পল্লব এবং পত্র সকলকে ঝড় ঝড় শব্দে সঞ্চালন করিতে লাগিল। সমুদ্র এবং হ্রদ সকল আপনাদিগের বিশাল তরঙ্গ উর্দ্ধে উত্থিত করিল।

সন্তরণশালী হংসের ন্যায় বৃহদাকার অর্ণবপোত সকল জলধি বারিতে নিমগ্ন হইতে লাগিল।

এমত সময়ে দিবাবসান, সন্ধ্যা দেবীর আগমনে ক্রমে অন্ধকার উপস্থিত হইলে রাজকুমার শূন্য হইতে অধঃস্থিত নগর সকলকে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুন্দর দেখিতে পাইলেন, স্থানে স্থানে এক একবার এক একটা আলোক দেখিতেছেন। কাগজে আগুণ লাগাইয়া দিলে যেমন তাহা হইতে এক একবার ফিন্‌কি বাহির হইয়া শেষে সকলই নিবিয়া কৃষ্ণবর্ণ হয়, উহাও সেইরূপ হইল; রাজপুত্র তদ্দর্শনে পুলকিত হইয়া করতালি দিতেছিলেন, কিন্তু পুর্ব্ববায়ু নিষেধ করিয়া কহিল "যুবরাজ স্থির হও, দৃশ্য পদার্থের সৌন্দয্য দর্শনে এত উতলা হইও না, দৃঢ় করিয়া ধর, কি জানি পড়িয়া গেলে তোমাকে মন্দির সকলের চূড়ার উপর ঝুলিতে হইবে"।

উৎক্রোশ পক্ষী বা কত বেগে উড্ডীয়মান হইয়া বন জঙ্গল পার হইয়া যায়, পুর্ব্ববায়ু তদপেক্ষা অধিক বেগে ধাবমান হইল। তাহাতে সুবিখ্যাত অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহণ করিয়া কত বেগে বা ময়দান সকল পার হইয়া যায়, রাজ নন্দন তদপেক্ষা অধিক বেগে গমন করিতে সক্ষম হইলেন।

এই রূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুর্ব্ববায়ু কহিল, "ঐ যে অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতেছ উহার নাম হিমালয়, অসেচন খণ্ডের মধ্যে অমন উচ্চ পর্ব্বত আর একটিও নাই।

এক্ষণে আমরা ভুবনরূপ উদ্যানের প্রায় সন্নিহিত হই-য়াছি, অবিলম্বে তথায় গিয়া পৌঁছিব। ক্রমে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখে যে নানা প্রকার মসলা এবং পুষ্প-গন্ধ দ্বারা শূন্যমার্গ আমোদিত হইয়াছে, নিম্নভাগে কত প্রকার ডম্বুর এবং দাড়িম্ব সকল পক্ক হইয়া রহিয়াছে তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। বনজ অঙ্গুর লতাতে নীল এবং রক্ত বর্ণের অঙ্গুর ফল সকল থোপা থোপা ঝুলিয়া রহিয়াছে, দেখিলে কে না আশ্চর্য্য হয়। এক্ষণে তাহারা পৃথিবীর সেই স্থানেই অবরোহণ করিয়া হরিত তৃণোপরি উপ-বেশনপুর্ব্বক সেই মনোহর পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্যাবলো-কন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারের বোধ হইল পুষ্পেরা যেন মস্তক নত করিয়া পূর্ব্ববায়ুকে সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক কহিতেছে, আসিতে আজ্ঞা হউক, কিছু দিন এখানে আপনি সুখে অবস্থিতি করুণ। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কি এক্ষণে ভুবনরূপ উদ্যানের মধ্যে আসিয়াছি?।

পূর্ব্ববায়ু উত্তর করিল, “না, ইহা ভুবনরূপ উদ্যান নহে, ঐ যে প্রস্তরময় দেওয়ালের মধ্যে একটা অতি প্রশস্ত ছিদ্র দেখিতেছ, যাহার উপর অঙ্গুরলতা সকল প্রকাণ্ড একটা সবুজ মশারির ন্যায় ঝুলিয়া রহিয়াছে, ভুবনরূপ উদ্যানের কেবল ঐ একটি মাত্র পথ, উহার মধ্য দিয়া আমাদিগকে সেখানে যাইতে হইবে। আ-

মার কথা শুন, তোমার গাত্রের ঐ রেজাই খানি লেপ্টিয়া উত্তমরূপে জড়াও, এখানে দিনকরের যে প্রখর কিরণ দেখিতেছ, খানিক দূর গমন করিলে আর তাহা বোধ হইবে না, বরফের ন্যায় শীতল বোধ হইবে। আর একটি আশ্চর্য্য কথা শুন, যে যে পক্ষী ঐ গর্ত্ত দিয়া ভুবনরূপ উদ্যানে উড়িয়া যায়, তাহারা বোধ করে যেন তাহাদের একটা পাখা বিস্তারিত সূর্য্য-রশ্মিময় গ্রীষ্মকালের মধ্যে রহিয়াছে, আর একটা যেন হিমানী সংযুক্ত শীতকালের মধ্যে থাকিয়া একেবারে শীর্ণ হইতেছে।

রাজপুত্র তাহার কথাতে সায় দিয়া কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, ভুবনরূপ উদ্যানের বুঝি এই সেই যথার্থ পথ হইবে। অপর তাহারা সেই বিস্তারিত ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে বরফ যেরূপ শীতল হইয়া থাকে, ও স্থান তদপেক্ষাও শীতল, কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্তও শীত তাহাদের অনুভূত হইল না। পূর্ব্ববায়ু আপন পাখাগুলীন বিস্তারিত করিলে তাহা একেবারে অত্যুজ্জ্বল অগ্নিবৎ দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। উহা কি প্রকাণ্ড গর্ত্ত, জন্মাবধি এমন গর্ত্ত তাহারা কখনই দর্শন করে নাই। বৃহদাকার কদর্য্য প্রস্তর সকল তাহাদের মস্তকোপরি যেন ঝুলিতে লাগিল, আহা! ঐ প্রস্তর সকলের কি আশ্চর্য্য গঠন, কোনটা চতুষ্কোণ, কোনটা ত্রিকোণ, আর কোনটা হইতে বিন্দু বিন্দু জল নিঃসৃত হইতেছে।

তদ্দর্শনে রাজকুমার বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, ভুবন-

রূপ উদ্যানে যাইবার নিমিত্তে বুঝি আমাদিগকে যমপুরী ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্ববায়ু কিছুমাত্র উত্তর করিল না, কেবল অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইতে কহিল। কিয়দ্দুর গমন করিলে নীলবর্ণের আলোক তাহাদের চক্ষে লাগিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে প্রকাণ্ড প্রস্তরের কথা কহিয়াছি তাহা এক্ষণে কোয়াসার মত হইয়া যেন পূর্ণিমা তিথির রাত্রি কালীয় শুভ্রবর্ণ মেঘ হইল। পর্ব্বত-বায়ু যেরূপ শীতল হয়, গোলাপ পুষ্প পূর্ণিত উপত্যকা যেরূপ সদ্গন্ধ যুক্ত হয়, সেই রূপ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখে যে তথাকার বায়ু মাধুর্য্যভাবে অতি-মনোহররূপে বহন হইতেছে। সেখানকার নদী স্রোতের শোভার কথা কি বলিব, বায়ু যেরূপ নির্ম্মল বলিলাম, তথাকার বারিও সেইরূপ নির্ম্মল, স্বর্ণ এবং রৌপ্যময় মৎস্য দ্বারা সেই জল পূর্ণ ছিল, আরক্তবর্ণ রোহিত মৎস্য নীল-বর্ণের আভা প্রকাশ করিয়া সেই গভীর জল মধ্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। কত শত জলজ পদ্মের প্রশস্ত পত্র ঐ জলের উপরিভাগে রহিয়াছে তাহা গণনা করা যায় না। মেঘ ধনুর যেরূপ বর্ণ উহাদের সেই রূপ বর্ণ। অগ্নি শিখা যেরূপ হিরণ্ময় অথচ রক্তিমাবর্ণ হয়, পদ্ম পুষ্পগুলীন সেই রূপ রক্তাভা সংযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ ছিল। তৈল যেরূপ প্রদীপের শিখাকে রক্ষা করিয়া তাহা প্রজ্জ্বলিত রাখে, জলও ঐ পুষ্প ও জলচর সকলকে সেইরূপ সতেজ রাখিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছিল।

পূর্ব্বে যে সুখ পূর্ণ উপদ্বীপের কথা কহিয়াছি তাহা ঐ নদীর মধ্যস্থলে ছিল, তথায় যাইবার নিমিত্ত শ্বেত-বর্ণ প্রস্তরময় একটি শাঁকো নির্ম্মিত ছিল, কি রূপ কোমল ভাবে তাহা খোদিত হইয়াছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না, দেখিলে মনুষ্যের বোধ হইতে পারে, বুঝি সুখময় উপ-দ্বীপে যাইবার কারণ পথ প্রদর্শক স্বরূপ গোটা এবং কাঁচ নির্ম্মিত মালা সকল জলের উপরিভাগে স্থাপিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববায়ু রাজপুত্রের হস্ত ধরিয়া সংক্রমের উপর দিয়া চলিয়া গেল। পুষ্প এবং পত্র সকল তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার বাল্যাবস্থার বৃত্তান্ত সকল গান করিতে লাগিল, মনুষ্য জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তিই তেমন সুস্বরে গান করিতে পারে না। সেই দুঃখহীন স্থানের মধ্যে কতক গুলীন বৃহদাকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা যথার্থই তালগাছ বা আর কোন প্রকাণ্ড জলজ বৃক্ষ, রাজকুমার তাহা নিশ্চিত করিতে পারিলেন না, কি প্রকারে করিবেন, অমন শাখা পল্লব সংযুক্ত বৃহৎ বৃক্ষ তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। কোন কোন ধর্ম্ম-পুস্তকের চারিধারে আমরা যেমন সোনার জলদ্ এবং বিচিত্র বর্ণের কল্পিত লতা সকল দেখি, ঐ উদ্যানের চতুর্দ্দিকে লম্বা লম্বা সেই রূপ লতার মালা ঝুলিতেছিল। পক্ষী, পুষ্প এবং লতা সকল আশ্চর্য্যভাবে মিশ্রিত হইয়া এক অলৌকিক স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, শেষোক্ত বিষয় পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

রাজনন্দনের সন্নিকটে এক পাল ময়ূর হরিত তৃণোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মনোরম বিচিত্র বর্ণের পেখম বিস্তার করত সুখে নৃত্য করিতে ছিল। রাজপুত্র তাহাদিগকে জীবিত পক্ষী বোধ করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে লাগিলেন। স্পর্শমাত্র তাহারা যে বৃক্ষ ইহা তাঁহার উত্তম অনুভব হইল। ঐ ভুবনরূপ উদ্যানের মধ্যে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পত্র ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নানা বিধ বর্ণ দ্বারা বিচিত্র হওয়াতে সেই বৃক্ষকেই রাজপুত্র পূর্ব্বে ময়ূর বোধ করিয়াছিলেন। আহা হিংস্র জন্তুরাও সেখানে পরস্পর সদ্ভাবে কালযাপন করে। সিংহ ও ব্যাঘ্র দুই জন্তু বিড়ালের ন্যায় কোমলভাবে একটা সবুজ বর্ণ বেড়ার নীচে ক্রীড়া করিতেছিল। সে বেড়া এখানকার ন্যায় সামান্য বেড়া নহে। বনজ লতাদ্বারা তাহা বেষ্টিত থাকাতে উহার গন্ধে চারিদিক আমোদিত ছিল। বন্য কপোতেরা আপনাদের পাখা বিস্তারিত করাতে পরম সুন্দর মুক্তার ন্যায় তাহা ঝল্ মল্ করিতে লাগিল। তখন তাহারা পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া সিংহের স্কন্ধস্থিত কেশরের উপর উপবেশন করিল, এবং একটি হরিণও নির্ভয়ে ঐ সিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া মস্তক নাড়িয়া আহ্লাদ-সূচক শব্দ করিতে লাগিল, তাহার মনে যেন এই ইচ্ছা যে আইস তোমাদের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া আমি সুখে কালযাপন করি।

রাজকুমার ভুবনরূপ উদ্যানে উপবেশন করিয়া তত্রস্থ

বস্তু সকলের অলৌকিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছেন এমত সময়ে তদধিকারিণী পরি কয়েক জনা সুরূপসী সহচরীকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বস্ত্রের সৌন্দর্য্যের কথা বর্ণ দ্বারা বর্ণিত করা যায় না, সূর্য্যের বা কিরূপ দীপ্তি তদপেক্ষা তাহার দীপ্তি উজ্জ্বলীকৃত বোধ হয়। শিশুদিগকে স্তন্যপান করা-ইবার সময়ে মাতা যেরূপ আহ্লাদিত হইলে তাঁহার বদন মণ্ডল একেবারে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, ঐ পরির বদনমণ্ডলও সেই রূপ প্রফুল্ল ছিল, একে যুবতী তাহাতে আবার পরম সুন্দরী; যে যে রমণী রমণীয় বেশে তাঁহার সমভিব্যা-হারে ছিল, তাহাদের কেশের উপরিস্থিত খোঁপার উ-পরে এক একটি তারা উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি প্রকাশ করি-তেছিল। হোমাপক্ষী-দত্ত তালপত্রটি পূর্ব্ববায়ু তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে পরী তাহা অবলোকন করিয়া অতি-শয় হর্ষযুক্তা হইলেন। আর রাজনন্দনকে দেখিয়া তাঁ-হার হস্ত ধারণ করত আপন প্রাসাদে লইয়া চলিলেন।

আহা! ঐ প্রাসাদের শোভার কথা কি বলিব, রক্ত ক-মলে সূর্য্যের আভা লাগিলে যেরূপ দেখিতে সুন্দর হয়, উহার দেওয়ালে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া সেইরূপ শোভা-ন্বিত ছিল। ছাদের নীচের দিকটা অতি প্রশস্ত একটা উজ্জ্বল পুষ্পের ন্যায়, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে যদি তাহা নিরীক্ষণ করা যায়, তবে পুষ্পকোষ যেরূপ গভীর-ভাবে ক্রমে নিম্নীকৃত হয়, উহাও সেইরূপ বোধ হইবে।

রাজপুত্র জানালার সন্নিহিত একখান আয়নার ভিতর দিয়া দেখেন যে তাহার বহির্ভাগে অনেক প্রকার চিত্র বিচিত্র প্রতিমূর্ত্তি সকল লিখিত আছে। তাহাই বা কেমন আশ্চর্য্য! দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহারা যথার্থ জীবিতবান আছে। রাজপুত্র তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলে পরী ঈষৎহাস্য করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ঐ যে জানালাস্থিত সাঁড়সী গুলানকে দেখিতেছ, উহার এক এক খান কাঁচ মধ্যে পূর্ব্বকৃত ঘটনা সকল লিখিত আছে, উহা কালের নিজ লিপি, তিনি সময়ানুক্রমে আপনি আসিয়া ঐ কাচের উপরে ঘটনা সকল খোদিত করিয়াছেন, উহা নির্জ্জীব মুর্ত্তি এমন বিবেচনা তুমি কখনই করিও না, আয়না দিয়া বৃক্ষপত্র সকল বায়ু দ্বারা যেরূপ সঞ্চালিত হইতে দেখ, মনুষ্যগণকে ইতস্ততঃ যেরূপ গমন করিতে দেখ, ঐ দেখ কাচের মধ্যস্থলেও সেই রূপ হইতেছে। রাজকুমার আর এক-খান সাঁড়সীস্থিত কাচের নিকটে গিয়া দেখেন, তাহাতে প্রাচীন ইতিহাসের তাবৎ বৃত্তান্তই লিখিত হইয়াছে। জগতের মধ্যে যে যে ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহারা এক একটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ যেন ঐ পর-কলার মধ্যে গমনাগমন করিতেছে। তাহা দেখিয়া রাজনন্দন মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এতাদৃশ কৌশলে এমত উৎকৃষ্ট রচনা কি আর কেহ করিতে পারে, না, না, তাহা কালকৃত কর্ম্ম, কাল স্বয়ংই আপন হস্ত দ্বারা ঐ সকল কর্ম্ম করিয়াছেন।

অপর পরি রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া একটি অত্যুচ্চ পরম সুন্দর দালানে লইয়া গেলেন। তাহার দেওয়ালটি স্বচ্ছ, তন্মধ্য দিয়া বাহ্যবস্তু সকল দৃষ্টি করা যায়। অগণ্য তসবীর ঐ দেওয়ালে টাঙান রহিয়াছে, সকল গুলীন সমান নহে, এক একটা এক এক প্রকার, দেখিলেই বোধ হয় যে তাহাদের প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত উত্তম। লক্ষ লক্ষ কেবল মুখের আকৃতি। এমন কত তসবীর রহিয়াছে কেহই তাহার সঙ্খ্যা করিতে পারে না। সকল গুলাই সমভাবে একেবারে গীত গাইয়া হাস্য করিতেছে। আহা! এমন মনোহর সৌন্দর্য্যাবলোকনে কোন্ ব্যক্তি না হর্ষচিত্ত হয়। তন্মধ্যে যে সব তসবীর গুলা সর্ব্বো-পরিছিল, তাহাদের আকৃতি কেবল এক একটি গোলা-পের কুঁড়ীর ন্যায়, কাগজে চিত্র করিয়া দেখাইতে হইলে এক একটি বিন্দু দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। ঐ দালানের মধ্যস্থলে বৃহদাকার একটি বৃক্ষ স্থাপিত ছিল, উহার শাখা-পল্লব প্রশস্ত হইয়া ভূমি পর্য্যন্ত লোটাইয়া পড়িয়াছে। চীনদেশীয় লেবু গাছের হরিদ্বর্ণ পত্র মধ্যে যেরূপ সংখ্যাতীত ছোট বড় কমলালেবু ফলিয়া থাকে, ঐ বৃক্ষে হিরণ্ময় আতাফল সকল সেইরূপ অবস্থায় ছিল। রাজকুমার দেখিলেন, উহার প্রত্যেক পত্র হইতে রক্তাভাসংযুক্ত এক এক ফোঁটা শিশির পড়িতেছে, তা-হাতে তাঁহার উপলব্ধি হইল, যে বৃক্ষ বুঝি রক্তাশ্রু পাতিত করিয়া আপন দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

পরী বলিলেন, আইস রাজকুমার এক্ষণে আমরা নৌ-কারোহণ করিয়া ক্ষণকাল শীতলবায়ু দ্বারা আমাদের শরীর স্নিগ্ধ করি। আমরা উহাতে আরোহণ করিলেই উহা দুলিতে থাকিবে বটে কিন্তু যে স্থানে আছে, সেস্থান হইতে কিছুমাত্র সরিবে না। যত নড়িবে আপনকার ততই বোধ হইবে যে পৃথিবীস্থিত দেশ সকল যেন আস্তে আস্তে আমাদের কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই কথাতে রাজকুমার ঐ ক্ষুদ্র তরণীতে গমন করিয়া দেখেন যে পরীর কথা যথার্থই হইল। নদীর দুই তীরই যেন আশ্চর্য্য রূপে দোলায়মান হইতেছে, ক্ষণকাল পরেই দেখিলেন যে আলপ্সনামা উচ্চ পর্ব্বত হিমানী দ্বারা আবৃত হইয়া যেন ক্রমশঃ আগমন করিতেছে. সেখানে যেন নীল বর্ণ মেঘ সকল তাহার উপরি ভাগে লোটাইয়া পড়িয়াছে, কত শত দেবদারু বৃক্ষ ঐ পর্ব্বতে জন্মিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। উপত্যকার মধ্যে মেষপালকগণ বীণাবাদ্য করিয়া আহ্লাদে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বংশির ধ্বনি যেরূপ মনোরম হইয়া থাকে, উহা সেরূপ নহে, তাহা হইতে যত শব্দ বহির্গত হইতেছে, সকলই দুঃখ-সূচক। অপর তীরস্থিত কদলী বৃক্ষ সকল আপনাদিগের অতি ম্লান ক্ষীণ পত্রকে ঐ নৌকার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কৃষ্ণ বর্ণ রাজহংস পক্ষীরা জল মধ্যে মস্তক ডুবাইয়া সুখে সন্তরণ করিতে লাগিল। কত শত আশ্চর্য্য পুষ্প এবং জীবজন্তু সকল রাজকুমার তীর-

মধ্যে দর্শন করিলেন তাহার বর্ণনা করা যায় না। অত-এব তিনি চমৎকৃত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বাল্যকালে ভূগোল পড়িবার সময়ে পৃথিবীর পশ্চিমভাগ নিউহলাণ্ড নামে যে উপদ্বীপের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলাম, ইহা বুঝি সেই উপদ্বীপ হইবে। তাহা না হইলে নীলবর্ণ পর্ব্বত সকল আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিতেছে কেন? অবশ্যই উহা সেই উপদ্বীপ তাহার কোন সন্দেহ নাই, কেন না ধর্ম্ম-যাজকেরা আপনা-দিগের তন্ত্র সকল হস্তে ধারণ করিয়া মন্ত্র পড়িতেছেন, আর তত্রস্থ অসভ্য জাতিরা অস্থি নির্ম্মিত মৃদঙ্গ এবং শিঙ্গা বাজাইয়া সুখে নৃত্য করিতেছে। এইরূপে নৌকা-খানি যত দোলে, ততই তাহারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু দেখিতে পায়। মিশর দেশীয় শুণ্ডাকৃতি স্তম্ভ সকল উচ্চ-ভাবে মেঘ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া থাকে, বড় বড় থাম এবং অন্য কতক স্তম্ভ গুলান স্ত্রীলোকের ন্যায় মুখ এবং সিংহাকার অবয়ব করাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। তা-হাদেরও অর্দ্ধেকটা বালিতে পুরিয়া গিয়াছে, এসকলই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উত্তর দেশীয় আগ্নেয় প-র্ব্বত সকল নির্ব্বাণ হইয়া থাকিলেও উত্তর বায়ু তদুপরি জ্যোতির্ম্ময় ভাবে আপন কিরণ প্রদান করিতেছেন, তাহা দেখিয়া রাজকুমারের স্মরণ হইল, বাল্যকালে পাঠ করিতে করিতে আমি শিক্ষকের প্রমুখাৎ শুনি-য়াছি যে হিমকটির মধ্যস্থ দেশ সকলে প্রায় ছয় মাসা-

বধি সূর্য্যোদয় হয় না, বোধ করি তত্রস্থ লোক সকলে এইরূপ বায়ু কর্ত্তৃক আলোক প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের সাংসারিক কার্য্য সকল সাধন করিয়া থাকে, আহা স্বভাবের কি আশ্চর্য্য শক্তি! পৃথিবীস্থ কোন লোকেই বারুদ দ্বারা এতাদৃশ কার্য্য করিতে পারে না। তাঁহারা আর আর কত প্রকার অদ্ভুত বিষয় দেখিলেন এস্থলে কতইবা তাহার উল্লেখ করিব, গ্রন্থ বাহুল্য হইবার ভয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিতে পারিলাম না, কেবল ইহা বলিয়া ক্ষান্ত হই, রাজনন্দন নৌকারোহণ দ্বারা ঐ অপূর্ব্ব বস্তু সকল দৃষ্টি করিয়া একেবারে আহ্লাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজনন্দন পরীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন! ওগো, আমি আপনাকে ভুবনরূপ উদ্যানের একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উত্তর প্রদান করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, চিরকালের জন্য আমি এখানে বাস করিতে পারি কি না?।

পরী কহিলেন, রাজকুমার এখানে থাকা বা না থাকা সকলই তোমারই উপর নির্ভর করে, অত্রবাসী লোকদিগকে কতক গুলীন কর্ম্ম করণে নিষিদ্ধ আছে, সেই সকল কর্ম্ম করিবার বাসনা তুমি পরিত্যাগ করিতে পারিলেই এস্থলে অনায়াসে বাস করিয়া চিরকাল সুখে কাটাইতে পারিবে।

রাজনন্দন কহিলেন, বুঝিয়াছি জ্ঞানরূপ বৃক্ষের ফল

ভোজনে আপনি আমাকে নিষেধ করিতেছেন, অবশ্য তত্তুল্য সহস্র সহস্র উত্তম ফল এস্থানে থাকাতে আমি জ্ঞানরূপ বৃক্ষের আতার প্রতি কখনই প্রয়াসী হইব না।

তখন পরী কহিতে লাগিলেন, " শুদ্ধ কথায় বলিলে হয় না, রাজনন্দন মন নিবিষ্ট করিয়া আপনার অন্তঃকরণের ভাব সকল আপনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করুণ; যদি যথেষ্ট ধৈর্য্যশক্তি না থাকে তবে পূর্ব্ববায়ুর সঙ্গে পুনর্ব্বার গৃহে গমন করুন, তাহার যাইবার কাল আগত প্রায়, শত বৎসর পর্য্যন্ত সে আর এখানে আসিবে না। পৃথিবীবাসী লোকের পক্ষে শত বর্ষ একটা যুগ সদৃশ হয়, আপনি এখানে থাকিলে ঐ কালকে শত ঘণ্টাও বোধ হইবে না, কিন্তু যদি লোভ এবং পাপ পরবশ হইয়া অবিহিত কর্ম্মাসক্ত হও, তবে ঐ কাল তোমার পক্ষে যুগস্বরূপ হইয়া অতি দীর্ঘকাল হইবে। শুন রাজকুমার প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে অঙ্গুলী দ্বারা সঙ্কেত করিয়া আমাকে কহিতে হইবে, রাজনন্দন! আমার সঙ্গে আইস, কিন্তু তুমি কোন প্রকারে আসিও না, যেখানে ছিলে সেই খানেই থাকিবে। যদি এক বার আমার অনুবর্ত্তী হইয়া একটী পদ নিক্ষেপ কর, তাহা হইলেই তোমার আশালতা বৃদ্ধি পাইবে, আর তুমি স্থিরভাবে থাকিতে পারিবেনা, যে দালানে জ্ঞানরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে তোমাকে সেই স্থানে অবশ্যই যাইতে হইবে। প্রণিধান করুণ,

আমি সেই বৃক্ষের সৌরভ দ্বারা আমোদিতা হইয়া তাহারি অবলুণ্ঠিত শাখা তলে শয়ন করিয়া থাকি। আমাকে দেখিয়া তুমি বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে, কিন্তু কোন প্রকারে আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিব না, যদি ইন্দ্রিয় সুখে মুগ্ধ হইয়া রাজকুমার তুমি আমার ওষ্ঠাধরে একবার চুম্বন কর, তবেই ঐ সুখের আকর উদ্যান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পৃথিবীতলে নিমগ্ন হইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, এতাদৃশ লোভ সম্বরণ করণে তোমার শক্তি আছে কি না, যদি না থাকে, তুমি আর কখন এই উদ্যানকে দেখিতে পাইবে না। আর কত দুঃখ সহ্য করিতে হইবে তাহা বলিতে পারি না, শস্যহীন অরণ্য হইতে পবন রাজ বেগে গমন করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করত তোমার মস্তকোপরি শিলা-বৃষ্টি করিবেন, তাহাতেও যদি বাঁচ, তথাপি পরিত্রাণ পাইবে না, শোক আর দুঃখনামা দুই জন নির্দ্দয় পুরুষ তোমার অদৃষ্টাধীন হইয়া তোমাকে কত যন্ত্রণা দিবে তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না"।

অতঃপর রাজতনয় পরীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি এখানে বাস করিব, ইহাতে আপনকার কোন আশঙ্কা নাই। পূর্ব্ববায়ুও তাঁহার ললাট মণ্ডলে চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিল, দেখ রাজনন্দন, স্থির প্রতিজ্ঞ হও, পরি যেরূপ বলিতেছে সেইরূপ করিও, শত বর্ষ গত হইলেই আমি পুনর্ব্বার আসিয়া আপনকার সহিত

সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে বিদায় দাও, আমি চলিয়া যাই। রাজকুমার যথাবিহিতরূপে পূর্ব্ববায়ুকে বিদায় করিলেন। শীতকালে হিমকটিবন্ধ উত্তরবায়ু দ্বারা যেরূপ আলোকময় হয়, গ্রীষ্মকালে আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে ঘন ঘন সৌদামিনী যেরূপ আভা প্রকাশ করে, তখন পূর্ব্ববায়ু আপনার পাখা দুটি বিস্তারিত করিয়া সেইরূপ দীপ্তি প্রকাশ করিতে করিতে শূন্যমার্গে উঠিল।

উদ্যান, বৃক্ষ, এবং পুষ্প সকল পূর্ব্ববায়ুকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যেন উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল। আমরা সকলেই এক বাক্য হইয়া প্রার্থনা করিতেছি আপনি সুখে গমন করুন। তত্রস্থ বক এবং শকুনি পক্ষীরাও পূর্ব্ব বায়ুকে সমাদর করিয়া সারি সারি এক গাছি ফিতার ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে উড়িল, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্যানের সীমা সে না ছাড়াইয়া গেল, তত ক্ষণ তাহারা সঙ্গ পরিত্যাগ করিল না।

পরী বলিলেন, সম্প্রতি আমাদিগের নৃত্য করণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। রাজকুমার! আমি তোমাকে সাবধান করিয়াছি, দিবাবসান সময়ে সূর্য্যাস্তকালীন আমি নৃত্য করিতে করিতে তোমায় ইঙ্গিত দ্বারা বলিব, আমার সঙ্গে আইস আমার সঙ্গে আইস, কিন্তু সাবধান সাবধান তুমি কোন মতেই আসিওনা। শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে আমি তোমায় সেই রূপ সাধ্যসাধনা করিব, তুমি তাচ্ছীল্যভাব প্রকাশ করিয়া

ইহাতে বড় একটা মন দিওনা। দিন কতক নৃত্যের শেষ পর্য্যন্ত এই রূপ করিতে পারিলেই প্রতি দিন ক্রমশঃ ক্রমশঃ তুমি ধৈর্য্য শক্তি পাইবে, শেষে যতই ইঙ্গিত করিনা কেন কিছুতেই তোমার মনের চাঞ্চল্য হইবে না।

অনন্তর পরী রাজনন্দনকে অতি স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ পদ্মরাগ মণি খচিত একটি অট্টালিকার মধ্যে লইয়া গেলেন। ঐ সকল মণিতে পদ্মের বোঁটার ন্যায় এক একটি বোঁটা ছিল, তাহা পীতবর্ণ হওয়াতে স্বর্ণাভা সংযুক্ত ক্ষুদ্র মুরলী স্বরূপ হইয়া ঐ যুবতী দিগের তন্ত নির্ম্মিত যন্ত্র এবং বীণার শব্দানুসারে তাহাও যেন মধুরশব্দে গুণ গুণ করিতে লাগিল। পরম সুন্দরীগণ হীরাঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করত নৃত্যস্থলে নৃত্য করিতে লাগিল, তাহাদের ক্ষীণমাঝা সূক্ষ্মকায় এবং যুক্ত পদপ্রক্ষেপ সময়ে রাজনন্দনের বোধ হইল যেন শূন্যে তাহারা নৃত্য করিতেছে, আহা! তাহাদের গীতেরই বা কি মনোহরভাব, অমর আত্মা প্রাপ্ত হইলে যে অনন্তকালের নিমিত্ত পরম সুখে বাদ্য করা যায় এবং ভুবনরূপ উদ্যানের পুষ্পগণ যে চিরকাল প্রস্ফুটিত থাকে, এই ভাবে আনন্দ-জনক গীত তাহারা গান করিতেছিল।

দিবাকর অস্তাচল বাসী হইলেন, সমুদায় আকাশমণ্ডল একেবারে হিরণ্যময় হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট গোলাপীবর্ণে শ্বেতপদ্ম সকলকে রঞ্জিত করিল, যুবতী রমণীরা স্বর্ণপাত্রে মধু ধারণ করিয়া রাজপুত্রকে তাহা পান করিতে

ছিল, ঐ দুর্লভ মকরন্দপানে রাজপুত্র মোহিত হই-লেন, কেননা জন্মাবধি এমন পেয় বস্তু কখনই তাঁহার রসনাগ্রে সংলগ্ন হয় নাই। যে গৃহে ঐ জ্ঞানরূপ বৃক্ষ ছিল, এক্ষণে তাহার গবাক্ষ দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে রাজনন্দন উহার প্রতি অবলোকন করিবামাত্র ফলের জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষে যেন ঝাপ্সা মারিতে লাগিল। বাল্যকালে বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার মাতা যেরূপ গান* গাইয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন সেইরূপ মনোহর গীত তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন পরী কটাক্ষ ইঙ্গিত দ্বারা রাজকুমারকে অতি মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন, আপনি আমার সঙ্গে আইসুন, আপনি আমার সঙ্গে আইসুন! রাজনন্দন পরীর ডাকে বিমোহিত হইয়া পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার সকল একেবারে বিস্মরণ হওত তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হই-লেন। কি আশ্চর্য্য, তবু তাহা প্রথম দিন, এক প্রহর পূর্ব্বে তিনি আপনিই স্বীকার করিয়াছিলেন, তুমি বারম্বার ডাকিলেও আমি তোমার নিকটে যাইব না। যাহা হউক পরী পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে হাস্য বদনে কটাক্ষপাত করিয়া বারম্বার তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। এদিকে চতুর্দ্দিকস্থ পুষ্প এবং সৌরভান্বিত বৃক্ষের গন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা সকলেই একেবারে মত্ত হইয়া উঠিল, ওদিকে

---

* ঘুম যায় ঘুম যায়রে যাদু, ঘুম যায় ঘুম যায়।
সোনামণি ঘুমায় আমার যাদুরে ঘুমায়॥

বীণার মনোহর শব্দ মাধুরী দ্বারা সকলেই বিমুগ্ধ, জ্ঞান-রূপ বৃক্ষের চারিদিকে যেন লক্ষ লক্ষ হাস্যোন্মুখী রমণী বসন্তরাগে গান গাইয়া প্রকাশ করিতে লাগিল, "অবশ্যই আমরা সকল বিষয় জানিব, মনুষ্য পৃথিবীর কর্ত্তা স্বরূপ হইয়া অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ থাকিবে কেন?" রাজকুমার পূর্ব্ববৎ জ্ঞানরূপ বৃক্ষের পত্রে পতিত সে রুধিরাশ্রু আর দেখিতে পাইলেন না, এক্ষণে তাঁহার অনুমান হইল যে তৎপরিবর্ত্তে রক্তিম বর্ণ জ্যোতির্ম্ময় তারা সকল ঐ বৃক্ষ পত্র হইতে পতিত হইতেছে।

আমার সঙ্গে আইস, আমার সঙ্গে আইস, পরী এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ রাজকুমারকে ডাকিলে, তিনি ক্রমে ক্রমে পা উঠাইয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন, প্রত্যেক পদপ্রক্ষেপেই তাঁহার গালদুটি রক্তবর্ণ হইয়া যেন অত্যন্ত উত্তপ্ত হইল। শরীরের সকল স্থানেই প্রবল বেগে তাঁহার রক্ত পরিচালন হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! রমণী দিগের অঙ্গ ভঙ্গিমাতে মনুষ্য একেবারে মুগ্ধ হইয়া জ্ঞান বুদ্ধি সকলই হারাইয়া থাকে, এবং উন্মত্তের ন্যায় হইয়া কোন্ দুরূহ কর্ম্ম তাহারা না করে। রাজপুত্র মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "ঐ পরম সুন্দরী রমণী আমাকে আহ্বান করিতেছেন। আমি কেন তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী না হই, গেলেই বা ক্ষতি কি? অবশ্যই আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইব, ইহাতো পাপ নহে, এবং কোন মতেই আমায় পাপ স্পর্শিতে পারিবে না।

আমি তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া প্রত্যাগমন করিব ; আর তাহাকে চুম্বন করিলে হানি জন্মিতে পারে, যদি চুম্বন না করি তবেতো কোন হানি হইবে না, স্থির প্রতিজ্ঞ হইলাম আমি বিম্বোষ্ঠী পরীর মুখে কখনই চুম্বন করিব না। ভয় কি এ লোভকে সম্বরণ করিতে আমার ধৈর্য্যশক্তি আছে।

পরী তখন নৃত্যকালীন সুরম্য বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শুক্ল একখানি পট্টশাটী পরিধান পূর্ব্বক জ্ঞানরূপ বৃক্ষের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, ঐ বৃক্ষের ভূমিনত শাখা সকলকে তিনি স্বহস্তে সরাইয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক একেবারে অদৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

আমি এখন পর্য্যন্ত কোন পাপ করিনাই এবং পাপ করিবারও বাসনা নাই, ইহা বলিয়া রাজনন্দন সেই অবলুণ্ঠিত শাখা গুলিন এ ধার ও ধার করিয়া দেখেন যে পরী সম্পূর্ণরূপে নিদ্রাবস্থায় থাকিয়া স্বপ্নযোগে ঈষৎহাস্য করিতেছেন। ভুবনরূপ উদ্যানের সর্ব্বাধিকারিণীর যে রূপ সুখ সম্পত্তি হইতে পারে, পরী সেই রূপ মনের সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তথাচ রাজকুমার নত হইয়া তাহার বদন মণ্ডলের প্রতি অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার চক্ষের পক্ষ্ম দিয়া অশ্রু পতিত হইতেছে।

তদ্দর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত রাজকুমার চুপে চুপে কহিতে লাগিলেন, তুমি কি আমার নিমিত্ত রোদন করিতেছ?

ওরে স্ত্রী জাতির শ্রেষ্ঠা রমণী আর তুমি ক্রন্দন করিওনা, এ স্থানের সুখ, সম্প্রতি আমার বিশেষ উপলব্ধি হইল। তোমার রোদন আমার অন্তঃকরণে শেল স্বরূপ লাগিতেছে। আমি মনুষ্য হইয়াও তোমার সহবাসে চিরসুখী স্বর্গবাসীদের ন্যায় সুখ সম্ভোগ করিতেছি। যদি অনন্তকালের নিমিত্ত আমাকে ঘোর অন্ধকারে বাস করিতে হয়, তথাপি এতদ্রূপ যে ক্ষণমাত্র সুখ তাহাও আমার পক্ষে যথেষ্ট বোধ হইতেছে। ইহা বলিয়া রাজকুমার পরীর অশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয়ে চুম্বন করিয়া আপনার ওষ্ঠ দুটি তাহার ওষ্ঠদ্বয়ে রাখিলেন।

ইতিমধ্যে ঘোরতর ভয়ঙ্কর শব্দ পূর্ব্বক বজ্রাঘাত হইতে লাগিল, এতাদৃশ শব্দ পূর্ব্বে কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। তত্রস্থ প্রত্যেক বস্তু নিধন প্রাপ্ত হইয়া একেবারে বিলুপ্ত হইতে লাগিল, কোথায় পরী, কোথায় বা চিরপ্রস্ফুটিত পুষ্পযুক্ত উদ্যান, সকলেরই ক্রমে ক্রমে অধঃপতন হইল। রাজপুত্র দেখিলেন সেই পরম সুন্দর রমণীয় উদ্যান ঘোর অন্ধকার মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, দূরস্থিত নক্ষত্রগণ যেরূপ ক্ষুদ্রাকারে জ্যোতি প্রকাশ করে, ঐ উদ্যানকেও অবিলম্বে সেই রূপ দেখাইতে লাগিল। মৃত ব্যক্তির সমুদায় শরীর যেরূপ শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিনি সেইরূপ অবস্থায় চক্ষু মুদিত করত একেবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন কিছু মাত্র স্পন্দ রহিল না।

এমত সময়ে আকাশ মণ্ডল হইতে শৈত্যগুণযুক্ত অতিশয় স্নিগ্ধবৃষ্টি তাহার বদন সরোজে পতিত হইতে লাগিল, খরতর প্রবল বায়ু তাঁহার মস্তকোপরি সঞ্চালিত হইল। তদ্দ্বারা রাজকুমার পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন হাহাকার শব্দ করিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন, আর কহিলেন হায়! আমি নরাধম কি কর্ম্ম করিলাম, এ পাপিষ্ঠ দ্বারা সুখময় উপদ্বীপ নিধন প্রাপ্ত হইয়া একেবারে পৃথিবী তলে নিমগ্ন হইয়া গেল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দূরস্থিত নক্ষত্র একটি অবলোকন করিবামাত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, উহাই বুঝি পতিত উদ্যানের নক্ষত্র হইতে পারিবে, কিন্তু উহা তা নয়, আকাশ মণ্ডলে প্রাতঃকালীয় শুক উঠিয়াছিল।

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন যে পূর্ব্বোক্ত অরণ্যবর্ত্তী বায়ুগহ্বরের নিকট তিনি উপনীত হইয়াছেন। বায়ুমাতা ক্রোধপরবশ হইয়া আরক্তবর্ণ চক্ষু করতঃ তন্নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক হস্তোত্তোলন করিয়া কহিতেছে, আমি প্রথম দিবসেই অনুমান করিয়াছিলাম এই প্রকার ঘটনা ঘটিবে। রাজকুমার তুমি যদি আমার পুত্র হইতে, তবে এখনই আমি তোমাকে ঐ থলিয়ার ভিতরে পুরিতাম।

এমত সময়ে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষধারী কাজমুক্ত এক জন পুরুষ খড়্গ হস্তে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, তাঁহার নাম মৃত্যু। "বৃদ্ধার বাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়া তিনি কহি-

লেন, রাজকুমারকে থলিয়ার ভিতর রাখা অবশ্যই কর্ত্তব্য, তাহাতে আবার আশংকা করিতেছ কেন? কিছু দিন বিলম্বে আমি উহাকে শ্মশানশায়ী করিব, কিন্তু সম্প্রতি কিছু বলিব না. দেখি আর কিয়ৎকাল পৃথিবী মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া রাজনন্দন আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক ক্রমে সৎস্বভাব লাভ করিতে পারেন কি না"?

মৃত্যু আরও বলিল যৎকালে ইনি আমার আগমনের কোন প্রত্যাশা করিবেন না, এমত সময়ে আগমন করিয়া ইহাঁকে আমি এই কৃষ্ণবর্ণ থলিয়ার ভিতর পূরিব, এবং হস্ত মধ্যে স্থাপন করিয়া নক্ষত্র লোকে লইয়া যাইব। সেখানেও এক মনোহর উদ্যানে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, রাজকুমার সুশীল এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইলে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরম সুখে কাল হরণ করিতে পারিবেন। যদি ইনি দুরাত্মা এবং দুশ্চরিত্র হইয়া সর্ব্বদা কুচিন্তা এবং কু-অভিলাষে রত হন, যদি ইহাঁর মন কেবল পাপে আসক্ত হয়, তবে ভূবনরূপ উদ্যানকে বা ইনি কত অধো যাইতে দেখিয়াছেন, তদপেক্ষাও নিম্ন অতি গভীর স্থানে ইহাঁকে প্রেরণ করা যাইবে। সহস্র বর্ষের মধ্যে একবার আমি সেখানে গমন করিয়া ইহাঁকে নিজপুরীতে আনয়ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিব, স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া যদি পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হন তবে ঐ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র লোকে

ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব, যদি অধম দেখিতে পাই তবে দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক আরও অধিক নিম্ন স্থানে এই রাজকুমার প্রেরিত হইবেন।

এই কথা কহিয়া ধর্ম্মরাজ যম মহাশয় অন্তর্দ্ধান হইলেন। রাজনন্দন বিহিত বিধানে বায়ুমাতাকে নমস্কার করিয়া নিজ পিতৃ নিকেতনে আইলেন। হারাণ ধনকে পাইয়া তাঁহার পিতা মাতার আহ্লাদের আর ইয়ত্তা রহিল না, অজস্র অশ্রুধারা তাঁহাদের নয়ন যুগল হইতে পতিত হইল। রাজতনয় বিনয় বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া এই বায়ুচতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা এবং ভুবনরূপ উদ্যানের তাবদ্বিবরণ আদ্যোপান্ত কহিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার জনক জননী এবং আত্মীয় বন্ধুগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ক্রমে জানাজানি এবং শুনা শুনি হওয়াতে লেখকেরা এই উপাখ্যানটি লিখিয়া সর্ব্বত্র বালকদিগের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন। ইউরোপ খণ্ডে এই গ্রন্থ উত্তমরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে, বোধ হয় এদেশের বালকেরাও ইহা পাঠ করিয়া পর্য্যাপ্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন।

অনন্তর রাজনন্দন এক সুরূপসী ধর্ম্মপরায়ণা রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন, পতি পত্নী উভয়ে তাঁহাদিগের বড়ই সৌহার্দ্দ ছিল, কেহ কাহারও কোন প্রকারে অসন্তোষ জন্মাইতেন না। মহাকালের উপদেশানুসারে নৃপকুমার

পরাদমন দ্বারা নিজ চরিত্র শোধনে বিশেষ যত্ন করিয়া ছিলেন। শত শত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইতেন না, প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং মধ্যাহ্ন ত্রিকালেই তিনি নিজ ধর্ম্মপত্নীর সহিত ঈশ্বরারাধনা করিতেন। পরোপকার যে পরম ধর্ম্ম ইহা তাঁহার বিশেষ উপলব্ধি ছিল, এজন্য যাহাতে পরের অনিষ্ট হয় তিনি এমন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি নিরাশ্রয়ী অনাথদিগকে আশ্রয় দান, বিদ্যাহীনকে বিদ্যা দান, এবং দীন দরিদ্র আতুর লোকদিগকে যথোপযুক্ত সামগ্রী প্রদান করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতেং যমরাজ এক দিন হঠাৎ আসিয়া রাজতনয়ের পরমাত্মাকে পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রলোকের এক সুখময় রম্যোদ্যানে লইয়া গেলেন। তিনি সচ্চরিত্র মনুষ্য হইয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণে পবিত্রাত্মাদিগের সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

VERNACULAR LITERATURE SOCIETY.

অনুবাদক সমাজ।

বিজ্ঞাপন।

অনুবাদক সমাজের অধ্যক্ষেরা এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত সমাজের মনোনীত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। এই নিয়ম এক জনের এবং একবারের জন্য নহে, যখন যে ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাঁহাকে উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

১ ম। পুস্তকখানি সুনীতিসম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক।

২ য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে অথবা তদ্রূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে।

১ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র।

২ দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত।

৩ বাণিজ্য এবং লোকযাত্রা বিধান।

৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান শাস্ত্র।

৫ শিল্পবিদ্যা।

৬ শিক্ষাবিধান।

৭ জীবনচরিত।

৮ নীতিগর্ভ গল্প।

৩ য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক; বিশেষতঃ ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

৪ র্থ। পুস্তক খানি মুদ্রিত হইলে তাহার পৃষ্ঠার সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা ফরমার ১০০ এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়।

৫ ম। যে পুস্তকের নিমিত্ত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার প্রদান করা যাইবেক, সেই পুস্তক অনুবাদক সমাজের সম্পত্তি হইবেক, তাহাতে লেখকের কোন স্বত্ব থাকিবেক না।

৬ ষ্ঠ। নূতন লিখিত পুস্তক প্রথমতঃ সমাজের অধ্যক্ষগণের বিবেচনাধীন হইবেক, তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যেরূপ আদেশ করিবেন গ্রন্থকারকে সেইরূপ করিতে হইবেক। কিন্তু সকল গ্রন্থকারেরাই তাঁহাদিগের ইচ্ছামত যন্ত্রালয়ে কেবল প্রথমবার আপন আপন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ ম। পুস্তক প্রচারিত হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে ২০০০ দুই সহস্র পুস্তক যদি যথার্থতঃ বিক্রয় হয়, তবে সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রন্থকারকে পুনর্ব্বার পুরস্কার প্রদান করিবেন। ঐ পুরস্কার ৫০ পঞ্চাশ টাকার ন্যূন হইবেক না।

ই, বি, কাউয়েল।
বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটির
সেক্রেটরি।

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

বিজ্ঞাপন।

১ ম। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজকর্ত্তৃক প্রকটীকৃত নিম্ন-লিখিত পুস্তক সকল, গরাণহাট্টার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৬।১ সঙ্খ্যক সমাজের পুস্তকাগারে, মাণিকতলা ষ্ট্রিট নং ৪৬। ৪৭ সহকারি সম্পাদকের বাটীতে, স্কুলবুক্ সোসাইটী, রোজারু কোম্পানি এবং কলিকাতাস্থ আরং পুস্তক-বিক্রেতাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ব করিয়া লইবেন।

	পৃষ্ঠা।	মূল্য।
রবিন্‌সন্ ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বার্‌খানি চিত্রযুক্ত... ...	৩২৬	।৵০
পাল এবং বর্জিনিয়ার জীবন বৃত্তান্ত, চিত্রদ্বয়যুক্ত	২৫৫	।৵০
সেক্সপিয়র কৃত গল্প, ...	২১২	৶০
মনোরম্য পাঠ, ...	১১৪	৶০
রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত ...	৬৩	৵০
বৃহৎ কথা—প্রথম ভাগ ...	১০৯	।০
হংসরূপীরাজপুত্রদিগেরবিষয়, এক-চিত্রযুক্ত	৫৪	/১৫
পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা, ও নায়কশোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা এক চিত্রযুক্ত ...	৩০	/০

ছোট কৈলাস এবং বড় কৈলাস,	২৫	/০
চকমকিবাক্স, ও অপূর্ব্বরাজ যন্ত্র, এক চিত্রযুক্ত	৩০	/০
মৎস্যনারীর উপাখ্যান ...	৭৮	৶৫
চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর গল্প..	২৮	/০
অহল্যা হড়িডকার জীবন বৃত্তান্ত	১১৮	৶৫
নুরজাহান রাজ্ঞীর জীবন চরিত	১৮২	৸০
বায়ু চতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা ...	৪৬	/১০

এলিজিবেথ ... ...
জাহানিরার চরিত্র .. ...
কুৎসিত হংস শাবকের উপাখ্যান ...
এবং খর্ব্ব কায়ার উপাখ্যান ...
বৃহৎ কথা—দ্বিতীয় ভাগ ...
} ত্বরায় প্রকটিত হইবে।

২ য়। এই সকল পুস্তক মুদ্রিত করিতে যাহা ব্যয় হইয়াছে, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, সাধারণের উপকারার্থে তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

৩ য়। উক্ত পুস্তক সকল যাঁহারা একবারে অধিক সঙ্খ্যক ক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে শতকরা ২৫ টাকা কমিসন দেওয়া যাইবেক।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের
সহকারি সম্পাদক।

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

বিজ্ঞাপন।

১ ম। নিম্ন লিখিত, স্কুলবুক্ সোসাইটী প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের পুস্তক সকল, (অনুবাদক সমাজের স্থাপিত) গরাণ হাট্টার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৬।১ সঙ্খ্যক, গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তকাগারে বিক্রয় হইয়া থাকে। যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ব করিয়া লইবেন।

২ য়। কি দেশীয় কি বিদেশীয় সাধারণ পুস্তকবিক্রেতা মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, তাঁহারা এই সকল পুস্তক গ্রহণ করিলে, ইহার কমিসন বা ডাকের মাস্থল কিছুই দেওয়া যাইবেক না।

সত্য ইতিহাস সার	৸৹
অভিধান	৸৹
সার সংগ্রহ	॥৹
পশ্বাবলি	॥৵৹
ভুমি পরিমাণ বিদ্যা..	৸৵৹
বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ	৷৶৹
বঙ্গ দেশের ইতিহাস..	৸৹
কীথ সাহেবের ব্যাকরণ	৵৹
রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ	।৹
ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ	।৵৹
পিয়ার্স সাহেবের ভূগোল বৃত্তান্ত.. ...	।৵৹
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের গণিতসার ...	।৵৹
হারন সাহেবের গণিতাঙ্ক	।৵

মে সাহেবের অঙ্কপুস্তক	... ...	৵৷
বঙ্গভাষা বর্ণমালা ..	... ...	৴৷
বর্ণমালা—প্রথম ভাগ ..	... ...	৴০
বর্ণমালা—দ্বিতীয় ভাগ	... ...	৴১০
জ্ঞান দীপিকা	... ...	৵০
নীতিকথা—প্রথম ভাগ ..	... ...	৴০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ..	.. ...	৴০
ঐ তৃতীয় ভাগ	... ...	৴৫
মনোরঞ্জন ইতিহাস	... ...	৴১০
পত্র কৌমুদী	... ...	৶০
অদ্ভুত ইতিহাস, জঙ্গিস্‌খাঁর বৃত্তান্ত	...	৴১০
,, সিকন্দর সাহের দিগ্বিজয়..		৴০
,, তৈমুর লঙ্গের বৃত্তান্ত	...	৵১০
,, উইলিয়ম টেল	...	৴০
স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক..	... ...	৵০
শিশু পালন	... ...	॥০
গোপাল কামিনী ..	... ...	॥০
সত্য চন্দ্রোদয়	... ...	॥০
মনোহর উপন্যাস ..	... ...	।০
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত	... ...	॥০
চপলাচিত্তচাপল্য নাটক	... ...	॥০
দশকুমার	... ...	১৲
ভূমণ্ডলের মানচিত্র	....	৬৲
ভারতবর্ষের মানচিত্র	... ...	৪৲

৩ য়। বিবিধার্থসংগ্রহ, অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস—প্রাণিবিদ্যা—শিল্প—সাহিত্যাদি—দ্যোতক মাসিক পত্র, নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত, বড় বড় ২৪ পৃষ্ঠা পরিমাণে, সমাজের অনুমত্যনুসারে সন ১২৬৪ সালের বৈশাখ মাসাবধি বিদ্যোৎসাহী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। বিনা মাসুলে ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

৪ র্থ। বিবিধার্থ সংগ্রহে যে সকল চিত্র প্রকটিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার আদর্শ বিক্রয় করা যাইবেক; যাহার প্রয়োজন হয়, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সম্পাদক, ই, বি, কাউয়েল সাহেব (স্পেন্সর হোটেল ১৩ নং বাটী,) অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক, অথবা বিবিধার্থের সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করিবেন। মৃত বিটন্ সাহেব বিলাত হইতে যে সকল চিত্র আনাইয়াছিলেন তাহা গ্রন্থকারেরা বিনাব্যয়ে ব্যবহারার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৫ ম। নিম্ন লিখিত ডেপুটী ইনিস্পেক্টর মহাশয়েরা অনুবাদক সমাজের পুস্তক বিক্রয় বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব দূর দেশবাসী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তক সকল প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যেন উক্ত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ডাকের মাসুল লাগিবে না। কিন্তু কলিকাতা হইতে গ্রহণ করিলে ডাকের মাসুল তাঁহাদিগকে দিতে হইবেক।

নাম।	জেলা।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ	হুগলি।
কালিদাস মৈত্র ...	... বর্দ্ধমান।
উমাচরণ হাল্‌দার..	... মেদিনীপুর।
ব্রজমোহন মল্লিক..	... হাবড়া।
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	মুরশিদাবাদ।
হরিশঙ্কর দত্ত ...	... বাঁকুড়া।
ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়	... নবদ্বীপ।
রামলাল মিত্র ..	... রাজসাই।
পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়	... বীরভূম।
মেং এফ, জোহান্নেস	... মালদহ।
জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	. চব্বিশপরগণা ও বারাসত।
নীলমণি সেন ...	... পাবনা।
আলাহাদাদ খাঁ ..	... ফরিদপুর।
দিনবন্ধু মল্লিক ...	... ঢাকা।
শ্যামাচরণ বসু ...	... বরিসাল।
দয়ালচাঁদ রায় ...	... যশোহর।
মেং জ্যাকসন ...	... রঙ্গপুর।
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	... দিনাজপুর।
শ্যামাচরণ শর্ম্মা ..	... বোগড়া।
বৈকুণ্ঠনাথ সেন...	... মৈমুনসিং।
কমলনাথ ঘোষ...	... সিলহট।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক।
সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি মাণিকতলা ষ্ট্রীট
৪৬।৪৭ সঙ্খ্যক ভবন।

বাঙ্গালা সাহিত্য

—❀❀❀—
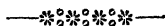
৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, সি-আই-ই
বিরচিত ইংরাজী প্রস্তাব হইতে

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
M.A., F.S.S., F.R.E.S.
কর্তৃক অনুবাদিত

কলিকাতা
১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

[মূল্য আট আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের যে রচনাই পাঠ করা যায় তাহাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণ মৌলিকতা, অপূর্ব্ব চিন্তা-শীলতা ও অলৌকিকী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী বাঙ্গালীর অতি প্রিয়। কিন্তু তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধাবলী এখনও সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয় নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের সহিত সেই দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলির পরিচয় ঘটে নাই। বিশেষতঃ, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকগণ এই সকল রচনার রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন। এই সকল কারণে আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্য'-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে তৎসম্পাদিত মাসিকপত্রে উক্ত প্রবন্ধগুলির বঙ্গানু-বাদ প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করি এবং প্রবন্ধগুলি তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দিই। তিনি প্রথমে আমাদিগকেই প্রবন্ধগুলির অনুবাদ করিয়া দিতে বলেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে আমরা স্বভাবতঃই সঙ্কোচ অনুভব করি এবং যোগ্যতর লেখকের উপর উক্ত ভার প্রদান করিতে

তাঁহাকে অনুরোধ করি। অবশেষে সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ও লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উক্ত ভার প্রদান করা হয় এবং তিনি "বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা"য় পঠিত বঙ্কিম চন্দ্রের দুইটী প্রবন্ধের সুন্দর অনুবাদ করেন। অনুবাদগুলি 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকায় এই অনুবাদ কার্য্যে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এবং সমাজপতি মহাশয় পুনর্ব্বার আমাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে আমরা সে অনুরোধ লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া 'মুখার্জীস ম্যাগেজিনে' ও 'কলিকাতা রিবিউ' ত্রৈ-মাসিকে প্রকাশিত আরও তিনটী প্রবন্ধের অনুবাদ করি। উহা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাবটী ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালের 'সাহিত্যে ধারাবাহিক ভাবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

মূল প্রস্তাবটি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১০৪ সংখ্যক 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেকালে উক্ত ত্রৈ-মাসিকে প্রবন্ধলেখকগণের নাম মুদ্রিত হইত না। বলা বাহুল্য, সম্পাদিত প্রবন্ধটির নিম্নেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষর ছিল না। সেই জন্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে তাঁহার নব-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ ও আলোচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বহুবৎসর পরে, 'কলিকাতা রিবিউ'

পত্রের প্রকাশকগণ "Selections from the Calcutta Review" নাম দিয়া পুরাতন 'কলিকাতা রিবিউ' হইতে নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের আয়োজন করেন। সেই সময়ে তাঁহারা যে 'অনুষ্ঠানপত্র' বাহির করেন, তাহাতে কার্য্যালয়ের কাগজপত্র দেখিয়া প্রবন্ধগুলির রচয়িতৃগণের নাম নির্দ্ধারিত করিয়া প্রকাশিত করেন। আমরা এই অনুষ্ঠানপত্র হইতে জানিতে পারি যে প্রবন্ধটি সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরই রচিত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক গবেষণা ও আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। সমালোচনায় অতুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বী সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধ বহুবৎসর পূর্ব্বে রচিত হইলেও উহাতে ভাবিয়া দেখিবার অনেক কথা আছে। প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কয়েকমাস মাত্র পূর্ব্বে —বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-রবি যখন প্রতিষ্ঠার সমুচ্চ শিখরের সমীপবর্ত্তী সেই সময়ে—রচিত। সেই হিসাবেও প্রবন্ধটি মূল্যবান। সুতরাং আশা করি, সুধী-সমাজে এই ক্ষুদ্র অনুবাদ-গ্রন্থখানি উপেক্ষিত হইবে না।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ১৭ই শ্রাবণ ১৩৩৫

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

চিত্র-সূচী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্য

—*:*:*—

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু, অতীত যুগে, জ্ঞানজগতে তাহাদের স্থান অতি নিম্নে ছিল। গ্রীসের অন্তর্গত বিওসিয়া প্রদেশ উহার অধিবাসিগণের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পুরাকালে বাঙ্গালা প্রদেশও ভারতবর্ষে বিওসিয়ার স্থান অধিকৃত করিয়াছিল।—এ কথা এক জন বাঙ্গালীলেখক বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রই বলিয়াছেন। এবং এই উক্তিটি অমূলক নহে। ভারতবর্ষের যে প্রাচীন সাহিত্য আজিও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছে, সেই সাহিত্যের পুষ্টির জন্য বাঙ্গালা প্রদেশ অতি সামান্যই দান করিয়াছে। বাঙ্গালী সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে একমাত্র জয়দেবই কিছু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন। কালিদাস, মাঘ, ভারবি ও শ্রীহর্ষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এরূপ একজন বাঙ্গালীরও নাম করা যাইতে পারে না। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে

বাঙ্গালা সাহিত্য

প্রাচীনতর সংস্কৃত সাহিত্যে কেবল এক জন বাঙ্গালীর নাম প্রসিদ্ধ,—মনুর টীকাকার কুল্লূক ভট্ট। ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এ যুগের বলা যাইতে পারে না। রঘুনন্দন ও জগন্নাথ উভয়েই ইদানীন্তন যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম বাঙ্গালী লেখকগণের আবির্ভাবকাল নির্দ্ধারিত করা দুঃসাধ্য, তবে বোধ হয়, তিন শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বে অতি অল্প পুস্তকই রচিত হইয়াছিল। যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা মধুর গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, সেই বিদ্যাপতিই নিঃসন্দেহ আমাদের অন্যতম আদিকবি। চণ্ডীর গানের রচয়িতা, 'কবিকঙ্কণ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী আকবরের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও একখানি অতিপ্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদির রচনা-কাল এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য স্বভাবতঃই পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যের চিন্তার ধারা বিভিন্ন, এবং রচনাকাল প্রায়ই পর্য্যায়ক্রমিক। এই কথা স্মরণ রাখিলে, গ্রন্থাদির রচনাকাল স্পষ্টভাবে জ্ঞাত না হইলেও নিম্নে লিপিবদ্ধ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সর্ব্বপ্রথম যুগ গীতিকাব্যের যুগ। এই যুগের প্রধান প্রবর্ত্তক বিদ্যাপতি। এই যুগের কবিগণ সকলেই বৈষ্ণব, এবং তাঁহাদের কবিতা হয় কৃষ্ণপ্রেম, নয় ত চৈতন্যলীলা-বিষয়ক। এই সকল গান এখনও বৈরাগীদের দ্বারা গীত হইয়া থাকে, এবং সাধারণে। উহা 'কীর্ত্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল গানের সংখ্যা অনেক। বর্ত্তমান লেখকের অধিকারে এই শ্রেণীর প্রায় তিন সহস্র সঙ্গীতের সংগ্রহ আছে এবং তাহার বিশ্বাস যে, এইরূপ বিস্তৃত সংগ্রহ আরও অনেক স্থলে আছে। যে সুরে এই সঙ্গীতগুলি রচিত তাহার একটু বিশেষত্ব আছে, এবং সাধারণতঃ বাঙ্গালার অনেক গীত ব্যবসায়ীও তাহা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত নহেন। গীতব্যবসায়িগণ কীর্ত্তনের সুরকে সুর বলিয়াই গণ্য করেন না, কিন্তু উহাতে এরূপ মধুর ও করুণরসের সংমিশ্রণ আছে যে, সচরাচর ভারত-বর্ষীয় সুরে তাহা দুর্ল্লভ। কিন্তু উহার মধুরতা অনেক সময়েই করতাল ও ঢক্কার অসমঞ্জস শব্দে নষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল গানের সুরেই যে কেবল বিশেষত্ব আছে, তাহাই নহে; উহা-দের ভাষারও কম বিশেষত্ব নাই। অনেক গুলি গান সম্ভবতঃ ইদানীন্তনকালে রচিত—কিন্তু অপর কতকগুলি যে বাঙ্গালা ভাষার আদিযুগ হইতে প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; এবং এই সকল গানের ভাষার, আধুনিক বাঙ্গালা

অপেক্ষা তুলসী দাসের হিন্দীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা ও প্রাচীন হিন্দীতে নিঃসন্দেহ অতি অল্পই পার্থক্য ছিল—বোধ হয়, মোটেই পার্থক্য ছিল না। মগধের গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের সময়, অথবা ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগের অন্যান্য বিপ্লবের সময় একই জাতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হওয়ায় এই ভাষার উচ্চারণগত বিভিন্নতা ঘটে, তাহা হইতেই ভাষার বর্ত্তমান পার্থক্য ঘটিয়াছে।

এই বৈষ্ণব গীতিকাব্যভাণ্ডারের বিপুল সংগ্রহের সকল সঙ্গীতই যে উচ্চশ্রেণীর হইবে, ইহা আশা করা অসঙ্গত, এবং অনেকেরই মনে হইতে পারে যে, এই সংগ্রহের দশ ভাগের নয় ভাগ রচিত না হইলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অবশিষ্ট দশমাংশের মধ্যে যথার্থই দুর্ল্লভ রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং ভাবের মাধুর্য্যে এগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব; এমন কি বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের রচনাও উহাদিগের সমকক্ষ নহে।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই এই শ্রেণীর সাহিত্যের বিষয়। দ্বিতীয় যুগের সাহিত্য পৌরাণিক বিষয়ে পরিপূর্ণ। এই যুগের প্রধান গ্রন্থ, মহাভারত ও রামায়ণের বাঙ্গালা সংস্করণ। উহাদের সঙ্কলনকর্ত্তা কাশীদাস ও কৃত্তিবাস ভারতবর্ষের এই

প্রাচীন মহাকাব্যদ্বয়ের কেবলমাত্র অনুবাদকর্ত্তা নহেন। তাঁহারা অনুবাদের হিসাবে সবিশেষ কৃতিত্বপ্রদর্শনের প্রয়াস পান নাই। কিন্তু অপর দিকে তাঁহারা অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই মহাকাব্যদ্বয়ের মূল হইতে কেবলমাত্র আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তিকে অব্যাহত গতি প্রদান করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলেই মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। আমরা একথা বলিতেছি না যে, তাঁহারা মূল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কাব্য রচনা করিয়াছেন (যদি মূল সংস্কৃত কাব্যের বিপুল আয়তন সংক্ষিপ্ত করায় কিছু উৎকর্ষ সাধিত না হইয়া থাকে), তবে তাঁহারা যে সকল অতিরিক্ত বিষয় সংযোজিত করিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃত কবি-গণের কল্পনার গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ণ হইলেও, তাঁহাদিগকে মৌলিক গ্রন্থকারদিগের মধ্যে উচ্চ আসন প্রদান করিবে। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ যদিও কোনও সংস্কৃত কাব্যের অনুসরণ করেন নাই, তথাপি তিনি এই যুগেরই কবি, এবং কবিত্ব-হিসাবে ন্যায়তঃ কৃত্তিবাস ও কাশীদাস অপেক্ষা উচ্চতর সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত কাব্যের অনেকস্থলের সৌন্দর্য্য মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার রচনা হইতে কোনও অংশ উদ্ধার করিবার স্থান নাই। এই সকল কবিদিগের ভাষায় হিন্দীর সংস্রব নাই, তথাপি উহা আধুনিক

বাঙ্গালা হইতে অনেক বিভিন্ন। কবিত্বশক্তির হিসাবে তাঁহারা প্রধান বৈষ্ণব কবিগণের অপেক্ষা নিঃসংশয়ে নিকৃষ্টতর।

আমরা তৃতীয় যুগের যে সকল লেখকগণের রচনার আলোচনা করিব, তাঁহারা নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্ব-কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদের মতে, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লেখক। কিন্তু তাঁহারা অনুচিত সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়ই অধিকতর পরিচিত। ইনি সেদিন অবধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এই খ্যাতি একেবারে বিনষ্ট না হইলেও, এক্ষণে দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গলের রচয়িতা বলিয়াই প্রধানতঃ ভারত-চন্দ্রের খ্যাতি। এই দুই কাব্যের কোনটিতেই বিশেষ গুণ নাই। তবে এ কথা স্বীকর্ত্তব্য যে, মালিনী হীরার চরিত্রের তিনি যে সতেজ ও সজীব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সুরুচি-সঙ্গত না হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। ভারতচন্দ্রের আর একটি প্রধান গুণ এই স্থলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য, তিনি আধুনিক বাঙ্গালার জন্মদাতা। তাঁহার ছন্দও অতি সুললিত, এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বর্ত্তমানকালের বহু প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের ছন্দকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উচ্চতর কবিত্বশক্তিতে ভারতচন্দ্র

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনেক কবি অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। তাঁহার রচনা স্থানে স্থানে অতিশয় অশ্লীলতাদোষ-দুষ্ট, এবং এই জন্য যে সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক কেবলমাত্র পুরুষজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, সেই সময়ে তাঁহার গ্রন্থাবলী পুনঃপ্রকাশিত হওয়া অবিধেয় বলিয়া বোধ হয়।

নবদ্বীপের কবিদিগের পরবর্ত্তী যুগে এবং বর্ত্তমান যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের সময়ে সাহিত্যের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, বোধ হয়, সাহিত্যের ইতিহাসে উহার আর তুলনা নাই। এই যুগে, 'নববাবুবিলাস' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকার' যুগে—পাঠ্য পুস্তকের (যে হিসাবে ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ্য, সে হিসাবেও) একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়;—সাহিত্যিক আবর্জ্জনার এরূপ বিপুল সম্ভার আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ এই আবর্জ্জনার স্তূপ এক্ষণে সাধারণের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

যে গান গতযুগের ধনী হিন্দুদিগের অতিশয় প্রিয় ছিল, এবং যাহার জন্য তাঁহারা প্রভূত অর্থব্যয় করিতেন, এই সময়েই সেই প্রসিদ্ধ 'কবির গানে'র সৃষ্টি হয়। 'কবির গান' কতকগুলি গানের সমষ্টি। গানগুলির মধ্যে সর্ব্বত্র সংযোগ থাকিত না, এবং দুইটি বিপক্ষ দলের গায়কগণ কর্ত্তৃক গীত হইত।

প্রত্যেকেই বিপক্ষদলের নিন্দা করিত, এবং এই নিন্দাবাদ যতই কটু হইত, নিন্দাকারী ততই প্রশংসাভাজন ও শ্রোতৃ-বর্গ ততই আনন্দিত হইতেন; সচরাচর এই সকল গান এরূপ জঘন্যভাবে গীত হইত যে, তাহা সঙ্গীত নামের বাচ্য নহে। যদিও কোনও কোনও স্থানে গানের সুর অতি মিষ্ট ও মধুর, গানের বিষয় প্রায়ই সামান্য কথা, অথবা কষ্টকল্পিত অতিরঞ্জিত কথায় পরিপূর্ণ—কিন্তু রাম বসু, হরুঠাকুর ও নিতাই দাসের কতকগুলি গানে কিছু বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ সৌন্দর্য্য আছে। বর্ত্তমানকালে জনসাধারণের অতি প্রিয় একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল! উহাকে 'নবোঢ়া পত্নীর বিলাপ' বলা যাইতে পারে। যে প্রেম কি তাহা জানিয়াছে, অথচ লজ্জায় যাহার মুখে বাক্য সরে না, এরূপ বাঙ্গালী বালিকা বধূকে যিনি জানেন, তিনিই উহার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।

"একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
হাসি হাসি যখন সে আসি বলে,
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়নজলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ফিরাতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁইও না।"

আমরা উৎকৃষ্টতর সঙ্গীত উদ্ধৃত না করিয়া এই সঙ্গীতটিই উদ্ধৃত করিলাম। তাহার কারণ এই যে, উহাই আজি কালি বাঙ্গালী জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা আর একজন লেখক সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি স্বয়ংই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর। আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথা বলিতেছি। তিনি অতীত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছেন, এবং তিনি তাঁহার সময়ের সাহিত্যিক দৈন্য, এবং শেষ কয়েক বৎসরের মধ্যে সংসাধিত উন্নতির প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পর দ্বাদশ বর্ষও অতিক্রান্ত হয় নাই; তথাপি আমরা তাঁহাকে এক অতীত যুগের কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। ইহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা-পদ্ধতির সহিত তাঁহার রচনা পদ্ধতির অনেক পার্থক্য আছে।

তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অল্পজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ভিন্ন আর কোনও ভাষা জানিতেন না, এবং তাঁহার মতও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারপূর্ণ ছিল; তথাপি বিংশ বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া তিনিই বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক ছিলেন; ব্যঙ্গ ও রহস্যপূর্ণ কবিতার রচনায় তিনি

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং এই গুণেই তিনি কি কবি, কি সম্পাদক, উভয় রূপেই সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর কোনও উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল না। এবং তাঁহার রচনা অত্যন্ত গ্রাম্য ও অসংস্কৃত। তাঁহার রচনাদি অধিকাংশ স্থলে জঘন্য অশ্লীলতায় কলঙ্কিত। অফুরন্ত অনুপ্রাস এবং অপূর্ব্ব শব্দালঙ্কারের ছটাই তাঁহার লোক-রঞ্জক হইবার প্রধান কারণ। যে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় নিকৃষ্ট কবিও লোকনয়নে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রতি-ভাত হইতেন, সে যুগের লোকের সাহিত্য-বিষয়ক রুচি ও বিচারবুদ্ধি যে কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই আমরা এই স্থলে তাঁহার কবিত্বের আলোচনা করিলাম। তিনি যে তাঁহার সামসময়িক বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করাও যায় না; কারণ, তাঁহার কিছু প্রতিভা ছিল, অপর লেখকদিগের কিছুই ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈন্যের জন্য আমরা যতই দুঃখ করি না কেন, গত পনেরো বৎসরে উহা যথেষ্ট উন্নতি ও আশার সূচনা করিয়াছে। এই অল্পকাল মধ্যে অন্ততঃপক্ষে এমন দ্বাদশ জন লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা প্রত্যেকেই, সুলেখকের যে সকল সদ্‌গুণ থাকা উচিত, সেই সকল সদ্-গুণে বিভূষিত, এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে

ঈশ্বর গুপ্ত

সর্ব্বাপেক্ষা লোকরঞ্জক এই লেখক (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে যে, এই অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন লেখক আধুনিক ব্রাহ্মদিগের অগ্রদূতস্বরূপ ছিলেন। অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাব প্রধানতঃ তাঁহার কাব্যেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার গদ্যরচনা সাধারণতঃ এই উভয় দোষ হইতে বিমুক্ত, এবং অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্ম ও সুনীতির পক্ষসমর্থক। তিনি যে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন, তাহা প্রদর্শিত করিবার জন্য 'হিতপ্রভাকরে'র গদ্যাংশ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্রাদির প্রধান মতবাদগুলির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ, তাঁহার ন্যায় অল্পশিক্ষিত সেকালের অনেক বাঙ্গালীই এই সকল মতবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। এই শ্রেণীর বাঙ্গালী দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

"হে নাথ! তুমি যে, এক কি পদার্থ, নিশ্চিতরূপে তাহা নিরূপণ করেন এমত ব্যক্তি এই মানবমণ্ডলে কাহাকেই দেখিতে পাই না। তুমি অরূপ, স্বরূপ, কিরূপ? আমি

তদ্বিশেষ কিরূপে জানিতে পারিব ?—তোমাকে তুমি আপনিই জান কি, না, তাহাও কেহ জানিতে পারেন না।—কারণ কোনোমতেই ইহা জানিবার বিষয় নহে।—তোমাকে "তুমি" এই বচন ভিন্ন আর কি বচনে ডাকিব ? আর কি বলিব ? —তোমাকে নির্গুণ বলিব ? কি সগুণ বলিব ? তোমাকে নিষ্ক্রিয় কহিব ? কি সক্রিয় কহিব ?—তোমাকে অকর্ত্তা কহিব ? কি কর্ত্তা কহিব ? তোমাকে বহুবিধ বিশেষণবিশিষ্ট কহিব ? কি বিশেষণবিহীন কহিব ? তোমাকে অসঙ্গ কহিব কি সসঙ্গ কহিব ?—কি কহিব ? কি কহিব ? তোমাকে কি কহিব ?—ইহার সার কথাটি আমাকে কে কহিবে ?—কি প্রকারেই বা নিশ্চিত নিদর্শন প্রদর্শন হইবে ? কেন না দর্শন তোমার দর্শন পান নাই, শাস্ত্র সকলের মধ্যে পরস্পর বিষমতর বিবাদ দেখিতেছি, এক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত একরূপ, অপর এক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আর একরূপ। * * * যাঁহার যতদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানের সীমা, তিনি ততদূর পর্য্যন্তই নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি, যে, কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ, তাহা কখনই বচনীয় হইবার নহে, এবং তুমি যতদূর রহিয়াছ ততদূর পর্য্যন্ত কেহই বোধনেত্র বিস্তার করিতে পারেন না।

"হে বপ্ত ! এই, যে 'আমি', আমি আমি করিতেছি, এই 'আমি'টি কি ? যখন তাহাই জানিতে পারি নাই, তখন

আমি 'নিজবোধনেত্রবিহীন' হইয়া তোমাকে জানিব ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—এই 'আমি' কে?—আমি আমাকে কেনই বা "আমি" বলি?—এবং এই আমাকে এই 'আমি' কে বলায়?—আমি, যে 'আমি' বলি, এ বলের কি আমিই বলী?—না 'তুমি' বল? তুমিই 'বলী'? বল বল, এই 'আমি' বলিবার বল, কাহার বল?—আমার বল? কি তোমার বল?—এই কথাটি কে বলে?—এ কথাটি কে বলে?— আমি বলি? কি তুমি বল? তাহাই বল।

আমার এই দেহপরিগ্রহ কেন হইল?—আমিই কি এই দেহ?—না আমার এই দেহ?—আমি দেহধর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া কেন দেহী হইলাম?—এই দেহে আমার 'আমি বোধ'ই বা কেন হইল?—এই শরীরটিই বা কি?—এই শরীর মধ্যে শরীরিরূপে আমিই বা কি?—আমি এই শরীরে এই 'আমি' অধুনা যেরূপ আমিই রহিয়াছি; এই আমি কি এই 'আমিত্ব' প্রথম পাইলাম?"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম এখন বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইতেছে, তাঁহাকে যাঁহারা আসনচ্যুত করিয়াছেন, আমরা সেই সকল লেখকগণের রচনার আলোচনা করিব। কিন্তু উহা করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে স্থূলভাবে কয়েকটি কথা বলিব।

বাঙ্গালা সাহিত্য

বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালা প্রদেশের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনায় এই প্রদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে অধিকতর উৎসাহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু যদিও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিদিন অসংখ্য গ্রন্থ ও সাময়িকপত্রাদি প্রসব করিতেছে, বর্ত্তমান সাহিত্যের মূল্য তাহার পরিমাণের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বস্তুতঃ যাহা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই আবর্জ্জনাস্বরূপ। কতকগুলি অধুনাপ্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তক আছে বটে, যাহা আমরা পরে প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিব, কিন্তু প্রতি বৎসর বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত অসংখ্য গ্রন্থাদির তুলনায় উহার সংখ্যা এত অল্প যে, উহা সমস্ত সাহিত্যের প্রকৃতিগত দোষ স্খালন করিতে পারে না। যে শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষার লেখক ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচক, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হইতে আমরা উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফলের প্রত্যাশা করিতে পারি না। অর্দ্ধ-শিক্ষিত ক্ষিপ্র-লেখকগণই বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রণয়নে ব্রতী। এই কার্য্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিজাতীয় ঘৃণা আছে, এবং ইঁহারা মাতৃ-ভাষায় লেখা নিতান্ত অপমানজনক মনে করেন। সমালোচনা তদধিক নিকৃষ্ট। যতদিন নিপুণ সমালোচনার একান্ত অভাব থাকিবে, ততদিন উন্নত ও সতেজ বাঙ্গালা সাহিত্যের

আবির্ভাবের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীও এই ক্ষেত্রে প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ন্যায়ই অক্ষম।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান লেখকদিগের সহিত পরিচিত, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইঁহাদিগকে —সুলেখক ও কুলেখক, সকলকেই—দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; 'সংস্কৃত' সম্প্রদায় ও 'ইংরাজী' সম্প্রদায়। প্রথম শ্রেণীর লেখকগণ দেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃত বিদ্যার প্রভাবে প্রভাবিত, এবং শেষোক্ত শ্রেণী প্রতীচ্য জ্ঞান ও সভ্যতার ফলস্বরূপ। বাঙ্গালী লেখকগণের অধিকাংশই সংস্কৃত-শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু সুলেখকগণের অধিকাংশই অপর শ্রেণীভুক্ত।

সংস্কৃত লেখকগণের অথবা য়ুরোপীয় গ্রন্থকারদিগের নিকট ঋণী নহেন, বর্ত্তমান কালে এরূপ খাঁটী বাঙ্গালী লেখকের শ্রেণী নাই। 'সংস্কৃত শ্রেণী'র লেখকগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সংস্কৃতলেখকদিগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের রচনায় মৌলিকতার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। 'ইংরাজী শ্রেণী'র লেখকদিগের রচনা প্রধানতঃ মৌলিকতার জন্যই 'সংস্কৃত শ্রেণী'র লেখকগণের রচনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। 'সংস্কৃত শ্রেণী'র লেখকদিগের বিশেষত্ব এই যে,

উঁহারা প্রায়ই মৌলিক রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন না। এমন কি, বিদ্যাসাগরের যশঃস্পৃহাও কতকগুলি গ্রন্থের অনুসরণ অথবা অনুবাদ অপেক্ষা ঊর্দ্ধে উঠে নাই। যদি তাঁহারা কখনও মৌলিক রচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহারা প্রায়ই তাঁহাদের পূর্ব্বগামিগণের অবলম্বিত পথেরই অনুসরণ করেন। আদিযুগ হইতে যে সকল কথা বারংবার কথিত হইয়াছে, শ্রদ্ধাসহকারে তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন। যদি প্রেমের বিষয় লিখিতে হয়, তবে পঞ্চপুষ্পশর হস্তে মদনদেবকে আনিতেই হইবে, এবং তৎসঙ্গে অলিকুল, কুসুম, সুমন্দ পবন এবং প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত অন্যান্য সহচর সমভিব্যাহারে দুর্দ্দান্ত বসন্তরাজ তাঁহার সাহায্যকল্পে অবতীর্ণ হইবেন। যদি বিরহের গীত রচনা করিতে হয়, তবে হতভাগ্য বিরহীকে তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা দগ্ধ করিতেছেন বলিয়া সুধাকরের নিন্দা করিতে হইবে ও তাঁহাকে অভিশাপ দিতে হইবে, এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে যেরূপ ভ্রমর, সুরভি কুসুম, সুমন্দ পবন প্রভৃতির উল্লেখ করা হইত, ঠিক সেই ভাবে তাহাদের উল্লেখ করিতে হইবে। এই সকল লেখক-দিগের রচনায় সুন্দরী রমণী হইলেই ইন্দুনিভানন, পদ্মনেত্র, মেঘসদৃশ কেশদাম ও গরুড়চঞ্চুবিনিন্দিত নাসিকা থাকিবে।

এই লেখকদিগের রচনা-ভঙ্গীও ভাবেরই অনুরূপ। চির-প্রচলিত প্রয়োগানুযায়ী শব্দবিন্যাসাদিই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং শ্রুতিকঠোর সংস্কৃতশব্দ-তরঙ্গের অবিশ্রান্ত গর্জ্জনে কর্ণকুহর প্রপীড়িত হইয়া উঠে। ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইলেও বিদেশীয়দিগের বচনবিন্যাসপ্রণালীর ছায়াও সতর্কতার সহিত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

এই অসহনীয় পাণ্ডিত্যগর্ব্ব টেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রথমে প্রতিহত হয়, এবং এই জন্য তিনি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসার পাত্র। উচ্চশিক্ষা এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির বলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এরূপ বিশুদ্ধসংস্কৃতা-নুসারিণী ভাষার সেবা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যে ভাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া সংস্কৃতজ্ঞগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এবং এরূপ ভাষার প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে, এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। রচনাপদ্ধতির চিরানুসৃত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া টেকচাঁদ তাঁহার রচনাবলীতে দৃঢ়প্রযত্নে পাণ্ডিত্যসূচক বাক্যবিন্যাস যথাসম্ভব পরিবর্জ্জিত করিলেন। সংস্কৃত শব্দের এইরূপ পরিবর্জ্জনে তাঁহার রচনার কিছু সৌন্দর্য্যহানি ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাষার এই সংস্কার অতি উপযুক্ত সময়েই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

তিনি পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষ আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি সাধনোচিত সাফল্য ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অপর কতিপয় লেখকও টেকচাঁদ ঠাকুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তদনুরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ, কবিবর মধুসূদন দত্ত ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালী জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপেক্ষা আর কেহই আমাদের অধিক-তর শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। হিন্দু বিধবাদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধনের জন্য তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন, একজন পণ্ডিত ও অধ্যাপক হইয়াও তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহাদের পক্ষসমর্থন করিয়া যে সৎসাহস প্রদর্শিত করিয়াছেন, এবং যেরূপ গভীর গবেষণা ও অবিচলিত অধ্যবসায়সহকারে তিনি উক্ত সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহার উদার পরহিতচিকীর্ষা এবং বাঙ্গালাভাষাশিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্বদেশ-হিতৈষিগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়াছেন।

দেশবাসিগণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনোপযোগী বহুবিধ এবং বিশিষ্ট সদ্‌গুণাবলী তাঁহাতে বিদ্যমান আছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট রচনাশক্তি তন্মধ্যে গণনীয় হইতে পারে না। তিনি সুলেখক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন সত্য; সেরূপ খ্যাতি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কাহারও উক্ত খ্যাতি যথার্থ প্রাপ্য নহে; উভয়েই তুল্যরূপে ঐরূপ খ্যাতির অনুপযুক্ত। অপর ভাষা হইতে সুচারুরূপে অনুবাদ করিতে পারিলেই যদি গ্রন্থকারদিগের মধ্যে উচ্চ-স্থানলাভের অধিকারী হওয়া যায়, তবে বিদ্যাসাগরের সে অধিকার আছে, এ কথা স্বীকার করি। যদি শিশুদিগের জন্য অতি উত্তম পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেই উক্ত অধিকার দঢ়ীভূত হইতে পারে, তবে বিদ্যাসাগরের দাবী প্রবল বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু অনুবাদ বা শিশুপাঠ্য পুস্তক-রচনায় উচ্চশ্রেণীর প্রতিভা-প্রদর্শন, আমাদের মতে, অসম্ভব। অনুবাদ ও শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা ভিন্ন বিদ্যাসাগর আর কিছুই করেন নাই। তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রস্তাব এ'স্থলে উল্লেখযোগ্য নহে, এবং বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে সকল পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধেও বর্ত্তমান প্রস্তাবে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। শিশুগণের স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি বাদ দিলে, তাঁহার পাঁচখানি মাত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অনুবাদ গ্রন্থ বাকী থাকে, যথা—হিন্দী হইতে অনূদিত 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি,' সংস্কৃত হইতে ভাষান্তরিত 'শকুন্তলা,' 'সীতার বনবাস,' এবং 'মহাভারতে'র উপক্রমণিকা, এবং ইংরাজী হইতে অনূদিত 'ভ্রান্তিবিলাস' বা Comedy of Errors। এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, অনুবাদ বা অনুসৃতিগুলি অতি সুন্দর। বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। 'সীতার বনবাস'ও অপর পুস্তক কয়খানির ন্যায় কোনও অংশে 'মৌলিক' নহে। উহার প্রথম অধ্যায়টি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নামক সুন্দর গ্রন্থ হইতে গৃহীত, এবং অবশিষ্ট তিনটি অধ্যায় মূল রামায়ণ হইতে, যে রামায়ণ হইতে ভবভূতিও রস সংগ্রহ করিয়াছিলেন—সেই রামায়ণ হইতেই সংগৃহীত; বস্তুতঃ 'সীতার বনবাস' পুস্তকখানি বাল্মীকির মহাকাব্য হইতে নির্ব্বাচিত কয়েকটি দৃশ্যের পুনর্ব্বর্ণনমাত্র। ইহার ভাষা অতি মধুর ও স্বচ্ছন্দগতি বিশিষ্ট, কিন্তু তাদৃশ ওজস্বিনী নহে। দৃশ্যগুলিও সুনির্ব্বাচিত এবং অলৌকিক অংশগুলি পরিত্যক্ত হওয়ায় অধিকতর বাস্তবানুরূপ হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্বসম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য লেখকগণের ন্যায় তাঁহার ভাষাতেও শব্দাড়ম্বর ও পুনরুক্তি দোষ লক্ষিত হয়।

আমরা 'সংস্কৃত' শ্রেণীর আর একজন মাত্র লেখকের

রামনারায়ণ তর্করত্ন

উল্লেখ করিব। তাঁহার নাম পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁহার রচনার কোনও বিশেষ গুণের জন্য নহে, তাঁহারও খ্যাতি আছে বলিয়াই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে একখানি কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে লিখিত 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব', এবং আর একখানি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লিখিত 'নবনাটক'। 'রত্নাবলী', 'মালতী-মাধব' এবং 'শকুন্তলা'রও তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদগুলি অতি জঘন্য, এবং তাঁহার স্ব-রচিত মৌলিক গ্রন্থগুলির ন্যায় শব্দাড়ম্বরপূর্ণ। ফলতঃ, আমাদের বিবেচনায় এই লেখকের যশোমাল্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক অপাত্রে অর্পিত হইয়াছে।

এই লেখকের পর আমরা সানন্দে ইংরাজী সম্প্রদায়ের লেখকগণের গ্রন্থাদির আলোচনা করিব। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামধারী বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা বলিয়াছি। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল।' ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নভেল বলা যাইতে পারে। গল্পাংশ অতি সরল, এবং সংক্ষেপে বিবৃত হইতে পারে। বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু এক জন বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। আদালতে চাকরী করিয়া, বিচারার্থিগণের উপর উপদ্রব করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জমীদারী ও সওদাগরী কর্ম্ম করিতেছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র

তাঁহার চারিটি সন্তান,—দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র মতিলাল মূর্খ, স্বার্থপর ও দুশ্চরিত্র যুবক, পিতার অযথা আদরে একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক জন গুরুমহাশয় তাহাকে বাঙ্গালা শিক্ষা দেন। ব্যয়সঙ্কোচের জন্য এক জন মূর্খ পূজারী তাহার সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত হন। এবং এক জন দরজী ব্যবসায় ছাড়িয়া তাহাকে পারস্য ভাষা শিক্ষা দেয়। তিন জনের শিক্ষাদানের ফল সহজেই অনুমেয়। গুরুমহাশয় কিছুদিন পরে ছাত্রের উপদ্রবে চাকরী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ছাত্রটি গুরুমহাশয়ের দধিতে চূণ মিশাইয়া দিত, তাঁহার কাপড়ের ভিতর জলন্ত কয়লা পুরিয়া দিত, এবং অন্যান্য নানাবিধ কৌতুক করিত। সুযোগ পাইলেই পূজারী বেচারীর মাথায় ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত। ছাত্রের এই কদভ্যাস কিছুতেই দমন করিতে না পারিয়া পূজারী বেচারীও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। মুন্সীর দাড়িতে মতিলাল একদিন অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেছিল। তিনি তদ্দণ্ডেই কার্য্য ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বাবুরাম বাবু পুত্রের প্রাচ্যভাষাদিতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইলেন, এবং ভাবিলেন, এইবার ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব, মতিলালকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। সেখানে সে একটি ইংরাজী স্কুলে

যাতায়াত করিতে লাগিল। কিন্তু পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় তাহার যেরূপ বিদ্যা হইয়াছিল, ইংরাজীতে তদপেক্ষা অধিক কিছু হইল না। সে ইয়ারদিগের সহিত তাস ও পাশা খেলা, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি উড়ান প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে মনোনিবেশ করিল। ইতোমধ্যে তামাক, চরস, ব্রাণ্ডীও ধরিল। একদিন এক গণিকালয়ে জুয়া খেলিতে খেলিতে সঙ্গীদিগের সহিত পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল। সকলেই দোষী প্রমাণিত হইয়া শাস্তি পাইল। কেবল মতিলাল তাহার পিতার পুরাতন বন্ধু মিঞাজান মিঞার কৌশলে নিষ্কৃতি পাইল। সে সপ্রমাণ করিল মতিলাল সেদিন অন্যত্র ছিল, ঘটনাস্থলে ছিল না। যাহা হউক, এই ঘটনার পরেই মতিলালের ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ হইল। সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, এবং শীঘ্রই তাহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

ইতোমধ্যে মতিলালের অনুজ রামলাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, এবং বরদা বাবু নামক জনৈক বুদ্ধিমান্ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে চলিতে লাগিল। সে পুস্তক পাঠে মনোযোগী হইল, এবং পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, এবং আর আর সকলের প্রতি শিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিল। সকল দিকেই সে এক জন আদর্শ বালক হইয়া উঠিল। কিন্তু

যে কারণেই হউক, বাবুরাম বাবু ও তাঁহার বন্ধুদিগের নিকট ইহা বিসদৃশ বোধ হইল, এবং তাঁহারা বরদা বাবুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইহার সহজ উপায়,—তাঁহার নামে ফৌজদারী নালিশ। অতএব মিঞাজান মিঞার সাহায্যে বিনা দোষে তাঁহার নামে এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হইল।

বরদা বাবু আমলাকে ঘুস না দেওয়ায় নিশ্চয়ই স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার শাস্তি পাইতেন, কেবল ইংরাজী ভাষা জানিতেন বলিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেটকে সকল অবস্থা পরিষ্কার বুঝাইতে পারিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন। কারণ, যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চুরুট, সংবাদপত্র ও গোপনীয় পত্রগুলির প্রতি অবহেলা না করিয়া সাক্ষীদের জবানবন্দী যতটুকু শুনিতে পারা যায়, ততটুকু মাত্র শুনিয়াছেন, তখন সেরেস্তাদার মহাশয় খুব দৃঢ়ভাবে সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আসামীর দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা হওয়া উচিত। কেবল ইংরাজী জানিতেন বলিয়াই বরদা বাবু নির্দ্দোষ বলিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

এই সময়ে উচ্চবংশীয় কুলীন বাবুরাম বাবুর নিকট এক বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। বিবাহে কিছু অর্থলাভের

সম্ভাবনা থাকায় তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। মতিলালের মাতা পতিপরায়ণা সতী ছিলেন। তিনি জীবিতা থাকিতেই বাবুরাম দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি দুইটি বিধবা পত্নী রাখিয়া গেলেন; তাহার মধ্যে এক জন বালিকা মাত্র। মতিলাল তখন পিতার গদীতে আরোহণ করিলেন। এবং যথাযোগ্য সমারোহের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। তাহার পর বিলাস-সাগরে আপনাকে নিমজ্জিত করিলেন। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য জলের মত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। মাতা কখনও সদুপদেশ দিতে গেলে তাহার পুরস্কার স্বরূপ প্রহার লাভ করিতেন। অতঃপর তিনি কন্যাকে লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে মতিলালের আনন্দের সীমা রহিল না।

অবশেষে, এরূপ স্থলে যেমন আশঙ্কা করা যায়, মতিলাল ঘোর দুর্দ্দশায় পতিত হইলেন। উত্তমর্ণেরা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লইল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজন বিজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেই পণ্ডিত তাঁহার চরিত্র সংশোধন করিলেন। কাশীতে তাঁহার মাতা ও ভগ্নী এবং বরদাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ

ও পুনর্মিলন হইল। সকলে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া একত্রে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

'আলালের ঘরের দুলালে'র গল্পাংশ এইটুকু মাত্র, কিন্তু এই পুস্তকের অন্যান্য গুণের তুলনায় গল্পটা কিছুই নহে। ইহাতে যে সকল মানব-চরিত্রের নক্সা আছে এবং বাঙ্গালী-জীবনের যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতেই এই পুস্তকের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। বিচারালয়ে যতটুকু জানিতে পারা যায়, অধিকাংশ য়ুরোপীয়গণ এদেশের লোকদিগের বিষয়ে তদতিরিক্ত কিছুই জানেন না। বিচারালয়-গুলি প্রায়ই এরূপ পাষণ্ড শ্রেণীর লোকে সমাকীর্ণ থাকে যে, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরে লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জাতির বিচার করে না, সেইরূপ বিচারালয়ে ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী ব্যক্তিও মিথ্যা কথা কহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন না। সুতরাং য়ুরোপীয়-দিগের নিকট দেশীয় জীবনের যথার্থ নক্সাপূর্ণ এরূপ পুস্তক অতীব মূল্যবান্। সত্য বটে, পুস্তকখানির কোনও কোনও স্থলে অতিরঞ্জন লক্ষিত হয়, এবং গল্পোল্লিখিত পাষণ্ডদিগের চিত্র খুব জীবন্ত ও চরিত্র-বৈচিত্র্যে সুপরিস্ফুট হইলেও, সজ্জনদিগের চিত্র বড়ই ছায়ার মত বোধ হয়। স্ত্রীচরিত্রগুলি অতি অস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত: সকলগুলিই একরূপ, এবং উক্ত

হইতে ভারতবাসীর দৈনিক জীবনে অন্তঃপুরবাসিনীদের কিরূপ প্রভাব, তাহার কোনও আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত দোষগুলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও বর্ণিত চিত্র ও চরিত্রগুলি পুস্তকখানিকে যথার্থ মূল্যবান্ করিয়াছে। পুস্তকখানি হইতে দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার আমাদের স্থান নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অমার্জ্জিত ও গ্রাম্যতাদুষ্ট হইলেও গ্রন্থকারের ভাষা কিরূপ সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক :—

"বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু, বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হরে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই এক জন ভট্টাচার্য্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুণ খেতে নাই—লবণ দিয়া দুগ্ধ খাইলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয় ইত্যাদি কথা লইয়া ঢেঁকির কচ্‌কচি করিতেছেন। এক পাশে কয়েক জন সতরঞ্চ খেলিতেছে, তাহার মধ্যে এক জন খেলওয়াড় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে—তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত—উঠসার কিস্তিতেই মাত। এক পাশে দুই জন গায়ক যন্ত্র মিলাইতেছে - তানপূরা মেও মেও করিয়া ডাকিতেছে। এক পাশে মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জ্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে,—অনেকের দেনা পাওনা ডিগ্রি ডিস্‌মিস্ হইতেছে,—বৈঠকখানা

লোকে থই থই করিতেছে। মহাজনেরা কেহ কেহ বলিতেছে মহাশয়! কাহার তিন বৎসর—কাহার চার বৎসর হইল আমরা জিনিস সরবরাহ করিয়াছি, কিন্তু টাকা না পাওয়াতে বড় ক্লেশ হইতেছে—আমরা অনেক হাঁটাহাঁটি করিলাম—আমাদের কাজ কর্ম্ম সব গেল। খুচুরা খুচুরা মহাজনেরা যথা তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা, সন্দেশওয়ালা তাহারাও কেঁদে ককিয়ে কহিতেছে—মহাশয়, আমরা মারা গেলাম—আমাদের পুঁটি মাছের প্রাণ—এমন করিলে আমরা কেমন করে বাঁচিতে পারি? টাকার তাগাদা করিতে করিতে আমাদের পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল,—আমাদের দোকান পাট সব বন্ধ হইল, মাগ ছেলেও শুকিয়ে মরিল। দেওয়ানজী এক একবার উত্তর করিতেছে—তোরা আজ যা—টাকা পাবি বই কি—এত বকিস্ কেন? তাহার উপর যে চোড়ে কথা কহিতেছে, অমনি বাবুরাম বাবু চোখ মুখ ঘুরাইয়া তাহাকে গালি গালাজ দিয়া বাহির করিয়া দিতেছেন।"

'আলালের ঘরের দুলাল' ব্যতীত টেকচাঁদ ঠাকুর আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 'রামারঞ্জিকা" নামক গ্রন্থখানি প্রধানতঃ স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথনের আকারে লিপিবদ্ধ নানাবিধ সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ের আলোচনার সমাবেশ। যে সকল রমণী অধিক বয়সে লেখা-

পড়া শিখিতেছেন, তাঁহাদের জন্যই এই পুস্তকখানি লিখিত হয়। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' নামক পুস্তকে ঐ শ্রেণীর আধুনিক বহু বাঙ্গালা পুস্তকের ন্যায় সুরাপানের দোষসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'যৎকিঞ্চিৎ' নামক গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা আছে, তেমন চিত্তাকর্ষক নহে। 'অভেদী' টেকচাঁদ ঠাকুরের অভিনব গ্রন্থ। ইহাতেও উল্লিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং এই গ্রন্থ লিখিয়াই তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার শিষ্যগণের রোষভাজন হইয়াছেন।

টেকচাঁদ ঠাকুরের পর 'হুতোমে'র নাম আপনা হইতেই আইসে। কারণ, টেকচাঁদ-প্রবর্ত্তিত রচনাভঙ্গীর অনুসরণকারী কৃতী লেখকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ বা হুতোম একজন সর্ব্বপ্রধান লেখক। বাল্যকালে তিনি সংস্কৃত হইতে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ 'মহাভারতে'র অনুবাদ করিয়া তিনি বিখ্যাত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকে এ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু অনুবাদক বলিয়াই তিনি প্রসিদ্ধ নহেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র প্রণেতা বলিয়াই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকে ডিকেন্সের 'Sketches by Boz'-এর মত সকল শ্রেণীর লোকের, এমন কি, সশরীরে

বর্ত্তমান ব্যক্তিগণেরও হাস্যরসোদ্দীপক আচার ব্যবহার প্রভৃতি সরস ও ওজঃপূর্ণ (যদিও অনেক স্থলে অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট) ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে চড়কপূজা, বারোইয়ারি হুজুক, বুজরুকী, বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার, এবং স্নানযাত্রার উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে 'হুতোমে'র রচনাভঙ্গীর কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সন্ধ্যার পর কলিকাতার বাঙ্গালীটোলার দৃশ্য—

"এ দিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ থাম্‌লো। সকল পথের সদরায় আলো জ্বালা হয়েছে। 'বেলফুল' 'বরফ' 'মালাই' চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েছে, অথচ খদ্দের ফিচ্চে না। ক্রমে অন্ধকার গা-ঢাকা হয়ে এলো, এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। ভুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় টুঁ মেরে মেরে বেড়াচ্ছেন; এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন, আবার ময়দা-পেষা দেখে বাড়ী ফির্‌বেন! মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণাগাছির গলী ও আহিরীটোলার

কালীপ্রসন্ন সিংহ
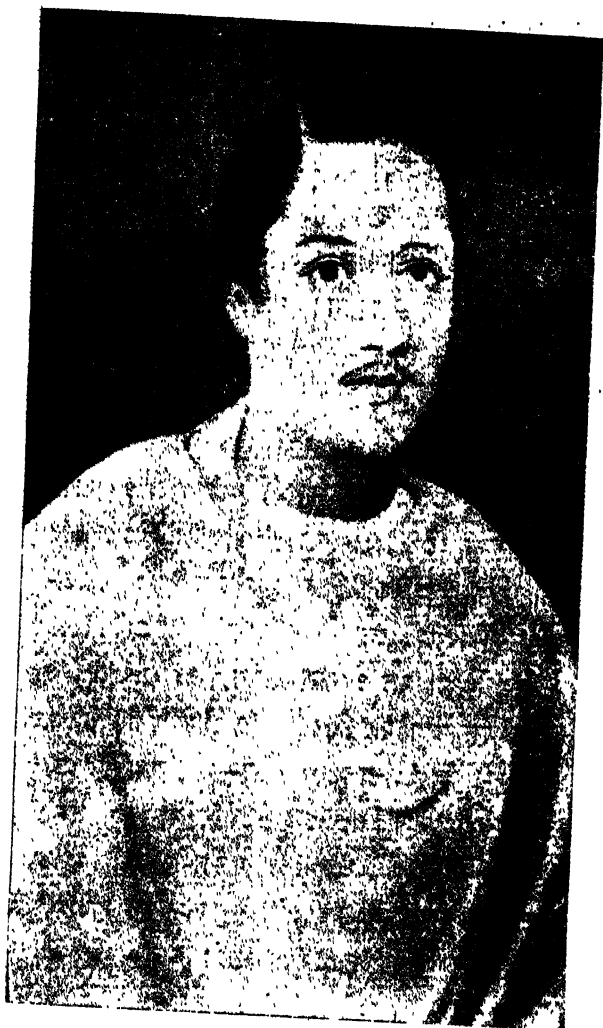
চৌমাথা লোকারণ্য, কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন, কেউ তাঁরে চিন্‌তে পার্‌বে না। আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে কেসে হেঁচে লোককে জানান দিচ্চেন। যে, 'তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস ক'রে থাকেন।'

"সৌখীন কুঠীওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ ক'রে সেতারটী নিয়ে বসেচেন। পাশের ঘরের ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার ক'রে—বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পড়্‌চে। পীল-ইয়ার ছোকরারা উড়্‌তে শিখ্‌চে। স্যাকরারা দুর্গা প্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাং ঝাল দিবার উপক্রম করেছে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ-কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে, রোকোড়ের দোকানদার ও পোদ্দার সোনার বেনেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ত কাটচে। শোভা-বাজারেব রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে ক'রে ওঁচা পচা মাচ ও নোনা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদেব 'ও গামচাকাঁধে, ভাল মাচ নিবি?" 'ও খেংরা-গুঁপো মিন্সে, চার আনা দিবি' বলে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেছুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা লাঠী হাতে ক'রে কাণা সেজে 'অন্ধব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ' ব'লে ভিক্ষা ক'রে মৌতাতের সম্বল কচ্চে। * * * *

"আজ নীলের রাত্রি। তাতে আবার শনিবার; শনিবার রাত্রে সহর বড় গুলজার থাকে! পানের খিলির দোকানে বেললণ্ঠন আর দেওয়ালগিরী জ্বলচে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর ক'রে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলেচে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়ীতে খেম্‌টা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে ঘুঙুর ও ও মন্দিরার রুণ্ রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন; কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারওয়ালা এক জন চোর ধ'রে বেঁধে নে যাচ্চে, তার চারি দিকে চার পাঁচ জন হাসচে আর মজা দেখ্‌চে, এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে; তারা যে একদিন ঐ রকম দশায় পড়বে, তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।"

প্রাতঃকালে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে :—

"এ দিকে গির্জ্জার ঘড়ীতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং ক'রে রাত চারটে বেজে গেল—বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েছে। উড়ে বামুনেরা ময়দার দোকানে ময়দা পিষ্‌তে আরম্ভ করেছে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাক্‌তে আরম্ভ করেছে; দু একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব

শোনা যাচ্চে; এখনও মহানগর যেন নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন,—'রামের মা চল্‌তে পারে না,' "ওদের ন-বউটা কি বজ্জাত মা' 'মাগী যেন জঙ্গী,' প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে রত দুই এক দল মেয়ে মানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েছেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে। পুলিশের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরীবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্ মস্ ক'রে থানায় ফিরে যাচ্চেন।

'গুড়ুম করে তোপ প'ড়ে গেল! কাকগুলো কা কা করে বাসা ছেড়ে ওড়্‌বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে, গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে, দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে, হুঁকার জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্‌সা হয়ে এলো—মাছের ভারীরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে—মেছুনীরা ঝগড়া কত্তে কত্তে তার পেছু পেছু দৌড়েছে। বদ্দিবাটির আলু, হাসনানের বেগুন বাজ্‌রা বাজ্‌রা আস্‌চে, দিশী বিলিতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ী পাল্কী চ'ড়ে ভিজিটে বেরিয়েছেন। জ্বর-বিকার, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। * * *

'টুলো পুজুরি ভটচাজ্জিরা কাপড় বগলে ক'রে স্নান কত্তে চলেছে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ী সকাল সকাল
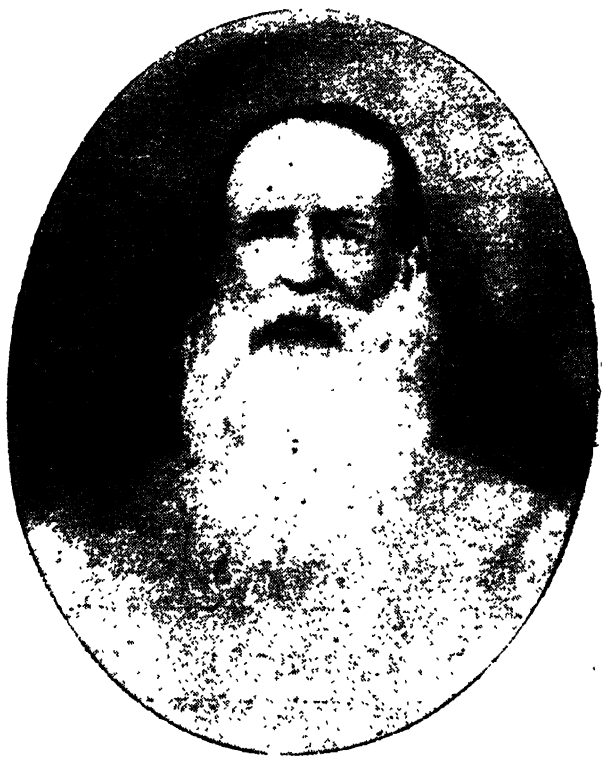
ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই

যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্ণিংওয়াকে বেরিয়েছেন।, উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে ক'রে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েছে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হ'লে গ্রাহকেরা পান না— ইংরাজী কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক।'

বিশুদ্ধ এবং ওজস্বিনী বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখক-গণের মধ্যে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁহার ভাষায় বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য-গর্ব্বিতা বিশুদ্ধতা নাই, অথচ টেকচাঁদ ও হুতোমের মত গ্রাম্যতা বা অশিষ্টতা নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি শিক্ষা-বিষয়ক পুস্তক ভিন্ন অন্য গ্রন্থ অল্পই লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষুদ্র পুস্তক-পাঠেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যেটুকু লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে উক্ত গ্রন্থ হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই।

গ্রন্থকারগণের মধ্যে অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই প্রথম বিবেচ্য। তিনি বিস্তর কবিতা ও নাটকের প্রণেতা। বোধ হয়, আর কোনও লেখকের দোষ গুণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সম্বন্ধে এত মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কোনও কোনও ভাব-বিহ্বল সমালোচক তাঁহাকে কালিদাসের সহিত তুলনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট লেখক বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আমরা উক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণের মধ্যে কোনও শ্রেণীর সমালোচকের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহার রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি ; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি নূতন পরিবর্ত্তন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে অনেক কটু সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে ; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার ন্যায্য স্থান বোধ হয় সকলের উপরে।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—'মেঘনাদবধ,' 'তিলোত্তমাসম্ভব,' বীরাঙ্গনা,' এবং 'ব্রজাঙ্গনা'। প্রথমোক্ত দুইখানি যে শ্রেণীর কাব্য তাহা য়ুরোপে 'এপিক্' নামে ও ভারতবর্ষে 'মহাকাব্য' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইখানিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ রচনা এই প্রথম। দুইখানির মধ্যে 'তিলোত্তমা' প্রথমে রচিত, কিন্তু 'মেঘনাদবধ'ই দত্তসাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে রামায়ণ হইতে ভারতীয় বহু কবি রসসঞ্চয় করিয়া কৃতী হইয়াছেন, গ্রন্থের

বিষয়টি সেই 'রামায়ণ' হইতেই গৃহীত—রাবণের সহিত রামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাবণের পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা মেঘনাদ রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত হন। আখ্যানবস্তুটি এই। কিন্তু দত্তসাহেব বাল্মীকির নিকট গল্পটি অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর ঋণী আছেন। তথাপি কাব্যখানি প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজস্ব। দৃশ্যাবলী, পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র-চিত্র, ঘটনাসংস্থান, এবং অবান্তর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অনেক অংশে দত্ত সাহেবের নিজের সৃষ্টি। উহাদের উদ্ভাবনে ও ক্রমপরিণতিতে দত্ত সাহেব উচ্চ অঙ্গের কলাকুশলতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমাদের যেটুকু স্থান আছে, তাহাতে বিস্তারিত ভাবে কাব্যখানির সমালোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা কবির কলা-কুশলতার যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে, বা পাঠকগণকে তাহার উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম। কেবল বাল্মীকি নহে, হোমর ও মিল্টনের নিকটও তিনি অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু যে সকল ভাব তিনি উক্ত কবিগণের নিকট সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পরিপাক করিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে, এই কাব্যগ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। পাত্রপাত্রীগণের কল্পনা অতি

সুপরিস্ফুট, এবং পাঠকের চিত্তমুগ্ধকর। ঘটনা-পরম্পরা যদিও অনেক স্থলে অতিলৌকিক, তথাপি অতি নিপুণ ও সহজ ভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রূপকাদি অলঙ্কারগুলি কোথাও মধুর, কোথাও করুণ, কোথাও বা রুদ্র-রসাশ্রিত। কল্পনার ক্রীড়া অনুক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা অত্যন্ত কবিত্বসম্পন্ন, এবং শব্দচয়ন এরূপ সুন্দর যে, পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল অন্যান্য ভাবও অনুরণিত হইতে থাকে। কবিতার চরণগুলি প্রচলিত সংস্কৃত প্রথা অনুসারে সকল স্থানে দুইটি দুইটি পংক্তিতে সমাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু মিল্টনের কবিতার ন্যায় যতি বা বিরামের স্থানগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, আমাদের মতে, পদগুলি অতি সুললিত ও সুখশ্রাব্য হইয়াছে, এবং আবেগময় ভাবপ্রকাশের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু দত্ত সাহেবের রচনা একবারে নির্দোষ নহে। উহাতে বিশ্রামের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ফুৎকারও অনাবশ্যক, সেখানে প্রবল ঝটিকা ভীষণ নিনাদে গর্জ্জন করে। যেখানে কোনও প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে মেঘাড়ম্বর ও অজস্র বারিপাতে বন্যার সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়; সমুদ্র অকারণ ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, এবং সকলের অনর্থক বিরক্তির উৎপাদন করে। দত্ত সাহেবের

ন্যায় মার্জ্জিতরুচি ও প্রতিভাবান্ লেখকের এরূপ বাগাড়াম্বর শোভা পায় না। একই রূপক ও শব্দঘটার বারংবার পুনরাবৃত্তিও তাঁহার একটি প্রধান দোষ, এবং পাঠকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিজনক। অপরের ভাব আত্মসাৎ করা দোষটিও যে একবারে নাই, তাহা বলা যায় না। হোমর ও ভার্জ্জিল হইতে স্থানে স্থানে চুরী আছে, এবং মিল্‌টন ও কালিদাস হইতেও ঐরূপ চুরী লক্ষিত হয়।

তাহার পর, ব্যাকরণের মর্য্যাদাও সকল স্থানে রক্ষিত হয় নাই। ইংরাজী পদ্ধতির অনুকরণে 'স্তুতিলা', 'স্বনিলা', 'নির্ঘোষিলা' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ঘন ঘন প্রয়োগেও আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। আমরা 'মেঘনাদবধ' হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলাম না; কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথকভাবে দেখিলে কাব্যখানির দোষগুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইবে না। সমগ্র কাব্যখানি সুন্দর, কিন্তু যেমন একখানি ইষ্টক দেখিয়া অট্টালিকার ধারণা হয় না, সেইরূপ এক একটি ক্ষুদ্র অংশ পাঠ দ্বারা কাব্যখানির সৌন্দর্য্য বিচার করা অসম্ভব।

দত্ত সাহেবের অপর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিলোত্তমাসম্ভব সর্ব্বপ্রথমে লিখিত। ইহাও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় 'এপিক' বা মহাকাব্য হইলেও, উহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বিষয়টি

তিলোত্তমার জন্ম। তিলোত্তমা ব্রহ্মার সুন্দরতম সৃষ্টি। আর্য্যদেবতাগণকে সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই প্রবল পরাক্রান্ত অসুর ভ্রাতা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করায়, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার জন্যই তিলোত্তমার সৃষ্টি।

'তিলোত্তমা'র পর আমরা সানন্দে 'বীরাঙ্গনা' নামক আর একখানি কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিব। মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবার স্পর্দ্ধা না থাকিলেও, এই কাব্যখানি 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা অধিকতর পরিপক্কতার পরিচায়ক। কতিপয় বীরাঙ্গনার স্বামীর প্রতি পত্রে লিখিত পত্রের আকারে ইহা পর্য্যায়ক্রমে রচিত। 'মেঘনাদবধে'র পরই ইহা রচিত হয়, এবং ইহাতেও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় সুন্দর রূপকাদি অলঙ্কার, ভাষার চমৎকারিত্ব, পদের লালিত্য ও শ্রুতিমধুরতা আছে। 'ব্রজাঙ্গনা' একখানি ক্ষুদ্র অসমাপ্ত কাব্য। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে রাধার বিরহ-বেদনা বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে এত কবিতা রচিত হইয়াছে যে, নূতনত্ব-সৃষ্টি একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু দত্ত সাহেব ইহাতেও অনেক নূতন ও সুন্দর ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং অমিত্রাক্ষরের ন্যায় মিত্রাক্ষর ছন্দেও অনুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার মিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার সনেট-

গুলির আমরা বিশেষ প্রশংসা করিনা, কিন্তু সেগুলিও অপ্রসিদ্ধতর গ্রন্থকারের যশোলাভের কারণ হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সনেটগুলি য়ুরোপে রচিত হয়। একটি ভার্সেলে লিখিত হয়। কতকগুলি দান্তে, আচার্য্য গোল্ড্‌ষ্টুকার, টেনিসন, ভিক্টর হুগো ও ইতালীকে সম্বোধন করিয়া লিখিত। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, সনেটগুলি বহু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রক্ষিপ্তভাবে রচিত।

নাট্যকার-রূপে দত্ত সাহেব তেমন কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত নাট্যগ্রন্থ—'শর্ম্মিষ্ঠা,' 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী'। প্রথমোক্ত নাটকখানি জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোনখানিই তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। এ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী লেখক নাটক-প্রণয়নে যথার্থ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। এমন কি, আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাট্যকার বাবু দীনবন্ধু মিত্রও মনুষ্য-হৃদয়ের উচ্চতর ভাবগুলি চিত্রিত করিতে গিয়া একবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। দত্ত সাহেব যখনই নাটক লিখিতে বসেন, তখনই তাঁহার অবিসংবাদিত কবি-প্রতিভা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তাঁহার প্রহসন-গুলি কিন্তু ভাল। তন্মধ্যে একখানি—'একেই কি বলে সভ্যতা?' বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-

খানি নিজগুণপ্রাচুর্য্য ব্যতীত অন্য কারণেও সমালোচনার যোগ্য।

আজি কালি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র বহু পুস্তক প্রসব করিতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই কোনও খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণমাত্র। বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম, দীনবন্ধু ও এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'-প্রণেতার অনুকারী অনেক হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয়, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে যত পুস্তক রচিত হইয়াছে, তত আর কোনও গ্রন্থের আদর্শে রচিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থখানি একটি বিশেষ অভিপ্রায়ে লিখিত প্রহসন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, অতিরিক্ত মদ্যপান ও তদানুষঙ্গিক দোষগুলি ব্যঙ্গসহকারে প্রকটিত করা। বটতলার ছাপাখানা ও পুস্তকের দোকানগুলিতে মদ্যপানের দোষ সম্বন্ধে এক আনা বা দুই আনা মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের রীতিমত বন্যা উপস্থিত হইয়াছে। একটু বৃহৎ আকারের প্রহসনও বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'বুঝলে কি না' নামক গ্রন্থখানি জনসাধারণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে, এবং অনেকবার ভদ্রমহোদয়গণের বাটীতে অভিনীত হইয়াছে। উক্ত সমুদায় গ্রন্থই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নকলমাত্র। সুতরাং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কেবল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইখানি প্রহসনের

অন্যতম বলিয়াই নহে, উহার অনুকরণে এতগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়াও, উহার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে।

এই প্রশংসনীয় ক্ষুদ্র পুস্তকখানির অংশবিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিলে, ইহার সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কারণ, ইংরাজী-শব্দসঙ্কুল উদ্ভট ভাষা এবং তর্কসভাদিতে ব্যবহৃত কৃত্রিম বাগাড়ম্বরেই উহার অর্দ্ধেক রস নিহিত আছে। নর্ত্তকী ও সুরাপানের আমোদে মত্ত 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী' নামক এক বৈজ্ঞানিক তর্কসভার গৃহে ইহার প্রধান দৃশ্য স্থাপিত। ইহাতে যেরূপ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতীব ঘৃণার্হ। প্রধান কথা এই যে, অঙ্কিত চিত্রগুলি সত্যের অনুরূপ কি না। বাঙ্গালার লজ্জার কথা হইলেও, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, চিত্রগুলি বাস্তবানুরূপ। সুরাপানে উত্তেজিত যে সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টা ইংরাজী-বচন-সংবলিত দীর্ঘ বক্তৃতামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, তাঁহাদিগকে য়ুরোপীয়গণ প্রায়ই যথার্থ সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে গণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন; কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। সুরাপান, নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গীর বেশভূষা-পরিধান ও বর্ব্বরোচিত ইংরাজী-ভাষার ব্যবহার যাঁহারা সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, ইঁহারাই যে সে সকল অর্দ্ধশিক্ষিত বাবুদের প্রতিনিধিস্বরূপ, তাহা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। ইহারাই দলে দলে সরকারী অফিস-সমূহে বিচরণ করেন, এবং উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে চাকুরীর আবেদনপত্র দ্বারা উদ্ব্যস্ত করিয়া থাকেন, সন্ধ্যাকালে কলিকাতার রাজপথসমূহে জনতাবৃদ্ধি করেন, মদ্যের বিপণী-গুলি শোষণ করেন, এবং যখন টাউনহলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতা করেন, তখন তাঁহারা শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশ আসন অধিকৃত করেন। যথার্থ শিক্ষালাভ তাঁহাদের কিছু মাত্র হয় নাই। ইহারা কোনও ইংরাজীস্কুলে কয়েক বৎসর মাত্র যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করেন, এবং ভাগ্যবন্ত হইলে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে উমেদারী আরম্ভ করেন। ধনবান্ হইলে ইঁহারা অসঙ্কোচে উক্ত বয়সেই গর্হিত আমোদ প্রমোদে ব্যাপৃত হন। এই শ্রেণীর লোকে দেশ প্লাবিত হইয়াছে, এবং দত্তসাহেবের চিত্রটি বাস্তবানুরূপ বটে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত ইহাদিগকে একশ্রেণীভুক্ত করা উচিত নহে—তাঁহাদের সংখ্যা (ইংরাজী শিক্ষার সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন) তুলনায় অতি অল্প।

এইবার আমরা দীনবন্ধু মিত্রের বিষয় কিছু বলিব। ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী নাট্যকার। একমাত্র উৎকৃষ্ট নাট্যগ্রন্থকার বলিলেও বলা যায়। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচখানি নাটক লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে দুইখানি প্রহসন। তাঁহার প্রথম

দীনবন্ধু মিত্র

গ্রন্থ 'নীলদর্পণে'র নাম বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত অন্য সকল গ্রন্থ অপেক্ষা য়ুরোপীয় জনসাধারণের নিকট অধিকতর পরিচিত। নীলবিপ্লব-সংক্রান্ত বলিয়াই উহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, নতুবা অন্য কোনও কারণে উহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিত না। যে বিচারালয় পক্ষপাতিতা ও চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক বিচার করিতে অসমর্থ বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়া শীঘ্রই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বিচারালয় কর্ত্তৃক লং সাহেব যখন দোষী বলিয়া দণ্ডিত হইলেন, তখন য়ুরোপীয় জনসাধারণের চিত্ত অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত সময়ে 'নীলদর্পণ' একখানি অশ্লীল ও ইতরোচিত নিন্দাবাদে পূর্ণ গুণহীন গ্রন্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। আমরা উক্ত মতের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি না, কিন্তু কাব্য হিসাবে আমরা এ গ্রন্থখানিকে অতি নিকৃষ্ট আসনের যোগ্য বিবেচনা করি। ইহার মূল্য যাহা কিছু ছিল, তাহা রাজনীতিঘটিত, কাব্য বলিয়া নহে। আমরা এক্ষণে কাব্যকলার বিষয় লিখিতে বসিয়াছি,—রাজনীতির বিষয় নহে; সুতরাং এ পুস্তকের বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না।

দীনবন্ধু বাবুর অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে 'লীলাবতী'ই জনসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ

করিয়াছে। কিন্তু যদিও আমরা ইহার অনেক সদ্‌গুণ আছে বলিয়া স্বীকার করি, তথাপি আমাদের বিবেচনায় 'নবীন-তপস্বিনী' অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থের অধিকতর দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু গুণের আধিক্যে তাহা আবৃত হইয়া গিয়াছে। সেক্ষপীয়রের **Merry Wives of Windsor** নামক নাটক হইতে ভাবটি লইয়া ইহা রচিত। গল্পটি একটি সুপরিচিত হিন্দু উপকথা। তাহার উপর এক জন হিন্দুফলষ্টাফের প্রেমলীলার অলঙ্কার চড়ান। ফলষ্টাফ-স্থানীয় পাত্রটির নাম জলধর। সে একজন রাজমন্ত্রী। তাহার দেহভার ও উদরের পরিধি কিঞ্চিৎ অসুবিধাজনক হইলেও, তাহার যৌবনসুলভ প্রেমপ্রবণতা কিছুমাত্র হ্রাস-প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার ভালবাসার পাত্রী মালতী, কালী-কান্ত নামক জনৈক সদাগরের যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী। মালতীর মল্লিকানাম্নী এক দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী আছেন। তাঁহার মন অতি পবিত্র হইলেও রসনাটি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ, এবং উহার ধার পরীক্ষা করিতে তিনি কখনই বিমুখ নহেন। মালতীর প্রতি জলধরের অনুরাগ ও প্রেম নিবেদনের কথা শুনিয়া, তিনি তাহাকে মালতী দ্বারা কার্য্যতঃ কয়েকটি শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাই নাটকখানির বিষয়ীভূত। প্রথমতঃ, মালতীর সহিত সাক্ষাতের ছলে জলধরের নিজস্ত্রীর সহিত

মিলন সংঘটন করা হইল। মালতীভ্রমে জলধর তাহার নিকট নিজস্ত্রীর নিন্দা ও মালতীর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল; কিছুক্ষণ পরেই কালীকান্ত আসিয়া পড়ায় জলধর পলায়ন করিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই স্ত্রীর নিকট সম্মার্জ্জনীর প্রহার সহ্য করিতে হইল। আর একটু হইলেই ক্রুদ্ধ কালীকান্তের নিকট মালতীবেশধারী দণ্ডিত হইত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয় দান করিয়া সে অব্যাহতি পাইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য, সদাগরের বাটী। সেইখানে জলধরের আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া সে আশ্বাস পাইয়াছে। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে জলধর নিজ প্রভু ভগ্নস্বাস্থ্য রাজাকে অনুরোধ করিয়া কালীকান্তকে আরবদেশে হোঁদলকুঁৎকুঁতে নামক কাল্পনিক জন্তুর মাংস সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইয়াছে। উক্ত জন্তুর মাংসই রাজার রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া রাজাকে সে বুঝাইয়াছে। মল্লিকার পরামর্শে সদাগর আরবদেশে না গিয়া নিজবাটীর সন্নিকটে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকে, এবং পূর্ব্বমন্ত্রণা অনুসারে যে সময়ে জলধর রমণীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সময়ে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কালীকান্তের হঠাৎ প্রত্যাবর্ত্তনে জলধর লুকাইবার উৎকৃষ্টতর স্থান না পাইয়া, অগত্যা একটি কদাকার মুখস পরিয়া একটা আলকাতরার পিপার মধ্যে

প্রবেশ করে, এবং তৎপরে একটা তুলার গাদায় লুক্কায়িত থাকে। তাহার ফল সহজেই অনুমেয়। অবশেষে তাহাকে পলায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়, এবং মল্লিকা তাহাকে একটি খিড়কীদ্বার দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। উক্ত দ্বারের সম্মুখে আরবদেশীয় জন্তুর জন্য নির্মিত একটি প্রকাণ্ড লৌহপিঞ্জর স্থাপিত ছিল। জলধর অন্ধকারে পিঞ্জরমধ্যে বেগে প্রবিষ্ট হয়, এবং মল্লিকা উহার দ্বারটি বন্ধ করিয়া দেয়। প্রাতঃকালে পিঞ্জরাবদ্ধ জলধরকে রাজসভায় লইয়া যাওয়া হয়। পথে অদ্ভুত জন্তু দেখিবার জন্য চারি দিকে লোকের ভিড় হইল। কেহ উহাকে ঢিল মারিতে লাগিল। পাছে লোকে চিনিতে পারে, এই ভয়ে ভীত হইয়া জলধর বন্যপশুর ন্যায় তীব্র চীৎকার ও লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল। অবশেষে সকলে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কালীকান্তও দেখা দিল, এবং সমস্ত ঘটনা যথাসময়ে বিবৃত হইল।

উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি নাটকখানির হাস্যরসের আশ্রয়ীভূত। ইহা ব্যতীত আর একটি গম্ভীররসাশ্রিত গল্প নাটকে স্থান পাইয়াছে। দুইটি গল্পের পরস্পর সন্নিবেশ তেমন দৃঢ় নহে। শেষোক্ত গল্পটি রাজা ও রাণীকে লইয়া। বহু বৎসর পূর্ব্বে রাণীকে রাজা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পরিত্যাগ

করেন। অনেকের ধারণা, তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। সকলের বিশ্বাস, তিনি জীবিত নাই। এক্ষণে সকলে রাজাকে রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মন রাণীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। অবশেষে রাজা এক ভিক্ষুক-রমণীর বেশে রাণীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে ঋষিবেশধারী সুন্দর যুবাপুরুষকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। রাজা যে সুন্দরীকে দ্বিতীয়স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ঋষিবেশী পুত্র তাহাকে ভালবাসেন, এবং অবশেষে উভয়ের বিবাহ হইল।

এই গম্ভীর রসের গল্পটি আদৌ প্রশংসাযোগ্য নহে। কিন্তু অপর গল্পটি অতি হাস্যোদ্দীপকভাবে রচিত হইয়াছে। জলধরের চরিত্রটি যদিও মূলতঃ সেক্সপীয়রের ফল্‌ষ্টাফ হইতে গৃহীত, তথাপি উহা সুসঙ্গত ও সজীব হইয়াছে, এবং কৌতুকপ্রিয়া অশেষকৌশলসম্পন্না চতুরা মল্লিকা দীনবন্ধু-বাবুর অঙ্কিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ত্রী-চরিত্র। জলধরের কুৎসিতা ও সন্দিগ্ধচিত্তা স্ত্রীর চিত্রও অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার স্থূলকায় বৃদ্ধ স্বামীকে দেশশুদ্ধ সমস্ত যুবতী পাইবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, এবং ছলচাতুরীর দ্বারা

বশীভূত করিবার চেষ্টায় আছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস পাঠকের কৌতুক উৎপাদন করে।

'লীলাবতী' অপেক্ষাকৃত উচ্চযশঃকামী গ্রন্থ। ইহার আখ্যানবস্তু বাস্তবাতিগ ও জটিল, এবং উহার সংগঠনে চিত্ত-বিভ্রমকারিণী কল্পনার আতিশয্য লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থ-খানি সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের স্থান নাই। আমরা কেবল এইটুকু অভিমত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে, যেমন 'নবীনতপস্বিনী'তে দীনবন্ধুবাবু সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট হাস্যরসিক বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ 'লীলাবতী'তে বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে তিনি যে রসিকতায় অদ্বিতীয়, তাহা প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে টেকচাঁদ বা হুতোম তাঁহার নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন নাই। 'নীলদর্পণ' এক্ষণে তাহার পূর্ব্বাধিকৃত উচ্চাসন হইতে বিচ্যুত হওয়ায়, লীলাবতী'ই পাঠক-সমাজে গ্রন্থকারের সকল পুস্তক অপেক্ষা অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছে, —কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, গ্রন্থকার এই গম্ভীর রসের নাটক অপেক্ষা হাস্যরসপ্রধান নাটক ও প্রহসনাদিতেই অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

দীনবন্ধুবাবুর দুইখানি প্রহসনের সমালোচনাই এক্ষণে অবশিষ্ট আছে। 'বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো' নামক প্রহসনে

একটি সচরাচর-দৃষ্ট বাতিকের সুনিপুণ ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজীব মুখুয্যে নামক এক বৃদ্ধ বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। 'পেঁচোর মা' নামক এক কদাকারা কৃষ্ণকায়া ডোমরমণীকে বিবাহ করিবার পরামর্শ দিয়া লোকে তাহাকে ক্ষেপায়। কয়েকজন স্কুলের ছাত্র বৃদ্ধকে প্রবঞ্চনা করিবার সঙ্কল্প করিল। একজন কৃত্রিম ঘটক বৃদ্ধের নিকট প্রেরিত হইল। বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়া গেল; বিবাহ হইবে, স্থির হইল। বালকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট এক জন বালককে কন্যার বেশভূষায় সজ্জিত করা হইল, এবং কতিপয় প্রতিবাসী কন্যার পুরুষ ও স্ত্রীবন্ধুরূপে সজ্জিত হইল। কৃত্রিম বিবাহ হইয়া গেল, এবং রাজীব বালকগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিয়া রজনী যাপন করিল। পরদিন প্রাতে যখন দেখিল পার্শ্বস্থ কন্যা 'পেঁচোর মা' ভিন্ন আর কেহই নহে, এবং সে একটি শূকরসন্তানকে পোষ্যপুত্র বলিয়া বৃদ্ধের কোলে দিতে চাহিল, তখন বৃদ্ধের মনের আতঙ্ক সহজেই অনুমেয়।

অপর প্রহসন—'সধবার একাদশী' নিপুণতরভাবে লিখিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা এরূপ অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট যে, আমরা উহার কোনও অংশ উদ্ধৃত করিতে, বা উহার সম্যক বিশ্লেষণপূর্ব্বক বিস্তৃত সমালোচনা করিতে

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষম। বিশেষতঃ গ্রন্থকারের রসিকতাতেই তাঁহার রচনার মনোহারিত্ব প্রধানতঃ নিহিত থাকায়, তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দেখান একবারে অসম্ভব। কারণ, যে সকল বাঙ্গালা শব্দ ও ভাবের সাদৃশ্যের উপর উক্ত রসিকতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা বিদেশীয়গণের বোধগম্য নহে।

অন্যান্য কতিপয় লেখকের বিষয় এখনও বলা হয় নাই কিন্তু স্থানাভাববশতঃ আমাদিগকে এ প্রস্তাব সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতে হইতেছে। রঙ্গলাল বাবু কবি বলিয়া স্বদেশীয়গণের নিকট উচ্চ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, তিনি এরূপ যশোলাভের উপযুক্ত কার্য্য অতি অল্পই করিয়াছেন। তাঁহার 'পদ্মিনী', 'কর্ম্ম-দেবী' এবং 'শূরসুন্দরী' নামক তিনটি কবিতা টডের 'রাজস্থান' হইতে সংগৃহীত তিনটি রাজপুত-রমণীর গল্প পদ্যাকারে লিখিত। 'পদ্মিনী' খানিই বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই লেখক ভারতচন্দ্রের পথাবলম্বনকারিগণের শ্রেণীভুক্ত, যদিও ভারতচন্দ্রের মত তাঁহার রচনায় অশ্লীলতার গন্ধ নাই। বাস্তবিক, তাঁহার লেখার যাহা কিছু গুণ, তাহা প্রধানতঃ কতকগুলি দোষের অভাবমাত্র।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও তাদৃশ যশস্বী হইতে

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (তরুণ বয়সে)

পারেন নাই, তথাপি রঙ্গলাল অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের কবি। তাঁহার 'ইন্দ্রের সুধাপান' ড্রাইডেনের Alexander's Feast এর একটি সজীব অনুকরণ।

উপন্যাসলেখকগণের মধ্যে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে'র লেখক বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বিষয় "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে ইতঃপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে একজন মাত্র লেখকের কথা এ স্থলে বলা প্রয়োজন বোধ হয়। তিনি বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইহার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনী' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত বাঙ্গালা গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বোধ হয়, অন্যরূপ সমালোচনা অপেক্ষা উক্ত তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ও অনায়াসে বর্ণনীয় 'কপালকুণ্ডলা'র উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে বিবৃত করিলেই ভাল হইবে।

নবকুমার নামক এক ব্রাহ্মণযুবক গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে হিজলীর নিকটস্থ বিজন সাগরতীরে সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন। ঐ স্থানের একমাত্র অধিবাসী একজন 'কাপালিক'। কাপালিকগণ এক অদ্ভুত সম্প্রদায়। তাহারা প্রচণ্ড ও ভীষণ তান্ত্রিক প্রণালীতে পূজা করে। শ্মশানঘাট তাহাদের মন্দির, এবং তাহাদের অনু-

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তরুণ বয়সে)

স্থানগুলি অতি বীভৎস ও পৈশাচিক। কাপালিকের নিকট যুবকটি আহার ও আশ্রয় পাইলেন। তাঁহার প্রয়োজনাদির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার বিকটদশন আশ্রয়দাতা প্রত্যাগমনের আশ্বাস দিয়া নরকপালের পানপাত্র লইয়া অন্যত্র যাত্রা করিলেন। দিনের পর দিন গত হইল, কিন্তু কাপালিক ফিরিলেন না। অবশেষে নবকুমার বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া যে পথহীন অরণ্যে কাপালিকের গুহা অবস্থিত, তাহার মধ্য দিয়া নিজেই নির্গমনের পথ আবিষ্কার করিয়া কোনও লোকালয়ে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি একবারে পথহারা হইলেন, এবং তাহার পর যে ঘটনা ঘটিল তাহা পুস্তকখানি হইতেই নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি; কারণ, উহার বর্ণনা দেশীয় পাঠকগণের নিকট বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে,—

"কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল; তিনি বুঝিলেন যে এ সাগরগর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল।

সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায় ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদাম-গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ—নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানে সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জলিতেছে। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ-বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধি-হৃদয়ে উড়িতেছিল।

"কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। * * * গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন।

ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদিবারিধি-তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার। * * অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না।—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।”

যে যুবতীর এইরূপ অনতিস্পষ্ট অথচ গম্ভীর বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি কপালকুণ্ডলা। সেকালে যে সকল পোর্ত্তুগীজ জলদস্যুপোত দাসসংগ্রহের জন্য বাঙ্গালাদেশের সাগরতীরস্থ গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত, তাহারই মধ্যে ঝটিকাতে ভগ্ন একখানি পোত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়। কাপালিক কি অভিপ্রায়ে তাঁহাকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন, তাহা কপাল-কুণ্ডলা জানিতেন না। কাপালিকের নিকট তিনি কালী দেবীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কাপালিক সুযোগ পাইলেই কালীর নিকট যে সকল নরবলি দিতেন

তাহা দেখিয়া কপালকুণ্ডলার অন্তরাত্মা ভয় ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইত। দুই জনে কাপালিকের গুহায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং শীঘ্রই বুঝা গেল যে, নবকুমারকে বলি দেওয়া হইবে। অসীমশক্তিধর কাপালিক তাঁহাকে দারু-স্তম্ভে বন্ধন করিয়া তদ্দণ্ডেই বলি দিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, কিন্তু কপালকুণ্ডলা বলিদানের খড়্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কাপালিক খড়্গান্বেষণে গমন করিলে তদবসরে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের বন্ধন ছেদন করিয়া তাঁহার সহিত পলায়ন করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা এক দেবমন্দিরে উপস্থিত হন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার প্রতি গভীর প্রেমাসক্ত হন, এবং কপালকুণ্ডলা বিবাহ কি বস্তু তাহা অবগত না থাকায়, নবকুমারকে বিবাহ করিতে কোনও আপত্তি করিলেন না। মন্দিরের পূজারী তাঁহাদের অনুরোধে উভয়ের বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত করেন। পূজারী তাঁহাদিগকে মেদিনীপুরে যাইবার পথও দেখাইয়া দিলেন। মেদিনীপুর হইতে উভয়ে নবকুমারের বাসস্থান সপ্তগ্রামে অনায়াসে উপনীত হইলেন।

এই বিবাহ নবকুমারের প্রথম বিবাহ নহে। তিনি পূর্ব্বে আর একবার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কন্যাটি নিতান্ত শিশু। পিতার সহিত মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ

করিতে বাধ্য হওয়ায় কন্যাটি পিতার সহিত দেশত্যাগ করিয়া যায়, এবং বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর আর পরস্পব সাক্ষাৎ হয় নাই। নবকুমারের সপ্তগ্রামে ফিরিবার পথে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। এক জন ধনাঢ্যা ও অতিসম্ভ্রান্ত পদবীর মুসলমান রমণী নবকুমারের নিকট কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হন, এবং নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, নবকুমারই তাঁহার স্বামী। ইনি নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী—এক্ষণে লুৎফ্‌উন্নিসা নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার রূপ ও বচনমাধুরী আগ্রায় সম্রাটের সভায় বারাঙ্গনা-গণের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছে, এবং অতুল প্রভাব ও অজস্র ধনের অধিকারিণী করিয়াছে। তাঁহার পিতা আকবর বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি নবকুমারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কপালকুণ্ডলাকে কয়েকখানি মহামূল্য অলঙ্কার দান করিলেন। নির্ব্বোধ বালিকা উহার মূল্য বা প্রযোজনীয়তা বুঝিতে না পারিয়া পথে প্রথম ভিক্ষুককে উহা অর্পণ করিলেন। লুৎফ্‌উন্নিসা সম্রাট্‌তনয় সেলিমকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে এক ষড়যন্ত্রের সহায়তা করিবার

জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন, সম্প্রতি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তাঁহার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি এক্ষণে অসম্ভাবিত-রূপে দেখা দিল। যে রমণী ইতঃপূর্ব্বে গর্ব্ব করিতেন যে, তাঁহার প্রস্তরনির্ম্মিত হৃদয় বাদশাহ বা তাঁহার পরিষদ-বর্গের মধ্যে কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তিনি এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বস্বামী—এই সৌম্যমূর্ত্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পথিকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি দেখিলেন, সেলিম রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার নিকট বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। সপ্তগ্রামে আসিয়া তিনি একখানি বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং নবকুমারের ভালবাসা পাইবার জন্য জাল পাতিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রেম তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের অলঙ্ঘ্য অন্তরায়স্বরূপ বিদ্যমান, তখন সেই প্রেম বিনষ্ট করিবার জন্য এক দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করিলেন।

কপালকুণ্ডলা এক্ষণে বৎসরাধিককাল নবকুমারের বাটীতে বাস করিতেছেন। তান্ত্রিক-অর্থযুক্ত কপালকুণ্ডলা নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া এক্ষণে তাঁহার নাম মৃণ্ময়ী রাখা হইয়াছে। তাহার বনচারিণীর মত স্বভাবও কিঞ্চিৎ

পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এ পরিবর্ত্তনে তিনি সুখী হন নাই। নবকুমার তাঁহাকে সতৃষ্ণ অন্তরে ভালবাসেন, কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান পান নাই। মহাদেবী কালীই তাঁহার সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়া আছেন, এবং তাঁহার পূজাতেই তিনি উন্মত্তবৎ নিযুক্ত থাকেন। তিনি নবকুমারের জন্য আবশ্যক হইলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসেন না, এবং অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকা তাঁহার অসহ্য। নবকুমারের আদেশ অবজ্ঞা করিয়া তিনি একদিন রাত্রিকালে গোপনে বহির্গত হইয়া এক সখীর জন্য পতিপ্রেমলাভের ঔষধ সংগ্রহ করিবার জন্য জঙ্গলে গমন করেন। একটী পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের নিকট গিয়া তিনি দুই জনের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন, এবং তাঁহার বোধ হইল তাঁহারই সম্বন্ধে কথা হইতেছে। তাহাদের মধ্যে এক জন (দেখিয়া বোধ হইল ব্রাহ্মণ যুবক) তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। পলাইতে পলাইতে দেখিলেন, এক জন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। বাটী পঁহুছিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি চিনিতে পারিলেন, ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বপরিচিত বিশালকায় কাপালিক।

কাপালিক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার পলায়নের পর

তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে পড়িয়া যাওয়ায় তাহার বাহু ভগ্ন হইয়া যায়। সে যখন অক্ষম অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া ছিল, তখন কালী তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কপালকুণ্ডলাকে তাঁহার নিকট বলিদান দিবার আদেশ করিলেন। যখন তাহার হস্তপদ পুনরায় কার্য্যক্ষম হইল, তখন সে দিবারাত্রি কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে তাঁহার সন্ধান পাইল। কিন্তু বলিদানের বেদিকার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অপরের সাহায্য আবশ্যক। সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণ যুবকের বেশধারিণী লুৎফ্‌উন্নিসার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময়েই কপালকুণ্ডলা আসিয়া পরামর্শের বিঘ্ন উৎপাদন করে। দুই জনের মধ্যে মতের ঐক্য হইল না। লুৎফ্‌উন্নিসার অভিপ্রায়, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান, কিন্তু কোনরূপ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইতে তিনি সম্মত হইলেন না। কাপালিকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লক্ষ্য করিয়া লুৎফ্‌উন্নিসা স্থির করিলেন, কপালকুণ্ডলাকে সকল কথা বলিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিবেন, এবং এইরূপে তাঁহার মনে কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করিয়া নিজকার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবেন। তদনুসারে পরদিন পথে কপালকুণ্ডলা একখানি পত্র কুড়াইয়া পাইলেন।

তাহাতে ব্রাহ্মণবেশধারী তাঁহাকে পুনরায় বনে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছে, এবং দেখা হইলে অনেক গুরুতর রহস্য-উদ্ঘাটনের অঙ্গীকার করিয়াছে। অন্য কোনও হিন্দু কুলবধূ এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিত না, কিন্তু কপালকুণ্ডলা করিলেন, এবং তাহাও অপরের অজ্ঞাতসারে নহে।

পূর্ব্বরাত্রে যখন কপালকুণ্ডলা বাটী হইতে বহির্গত হন, তখন নবকুমার দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে এ পর্য্যন্ত কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই—যদিও সহজেই এরূপ সন্দেহ উদ্দীপ্ত হইতে পারিত। পরদিন রাত্রিতে তিনি সতর্ক ছিলেন, এবং দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা পুনরায় বাটী হইতে নির্গত হইলেন। নবকুমারের উদ্বেগবৃদ্ধির আর একটি কারণ ঘটিল; লুৎফুন্নিসার পত্রখানি অলক্ষিতভাবে গৃহতলে পড়িয়া গিয়াছিল। নবকুমার সেখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন, এবং কপালকুণ্ডলার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহ হইতে বাহির হইতে না হইতে দেখিলেন, কাপালিক সম্মুখে দণ্ডায়মান। লুৎফ্‌উন্নিসার নিকট বিফলমনোরথ হইয়া দুর্দ্দান্ত কাপালিক এক্ষণে নবকুমারের মনে সন্দেহ উদ্দীপিত করিয়া তাঁহারই সহায়তা-লাভে সচেষ্ট হইল। সে নবকুমারকে নিজের ভূপতিত হওয়া ও স্বপ্নে কালীদর্শন, এবং ভবানীর আদেশের কথা বিবৃত করিল, এবং কপালকুণ্ডলা

নষ্টচরিত্রা ও অবিশ্বাসিনী হইয়াছে, এই কথা সদর্পে ঘোষণা করিয়া তাহাকে বলিদান করিবার জন্য সহায়তা প্রার্থনা করিল। নবকুমার এতদ্বিষয়ে প্রমাণ চাহিলে, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে লুৎফুউন্নিসার সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের কথা ও তাহার ভীষণ অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন, এবং নিজের পরিচয় ও জীবনকথা ও উদ্দেশ্যও জ্ঞাপন করিলেন; এবং কপালকুণ্ডলা যদি তাঁহার স্বামীকে কোনও কথা না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে তিনি তাহাকে বিস্তর ধন দান করিবেন, এবং কোনও দূরদেশে সুখে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কপাল-কুণ্ডলা এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিতেন; কারণ, স্বামীর প্রতি তাঁহার যথার্থ অনুরাগ ছিল না। কিন্তু যখন ভবানীর আদেশের কথা একবার তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন সে আদেশপালন ভিন্ন অন্য অভিলাষ তাহার মনে স্থান পাইল না। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং অদূরে কাপালিক ও নবকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কারণ, তাঁহারা প্রথম হইতেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কাপালিক নবকুমারকে সুরাপান করাইয়া উন্মত্তপ্রায় করিয়া-

ছিল। সুতরাং নবকুমার কাপালিকের অভিপ্রায়-অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সকলেই বলিদানের স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্থানটি শ্মশানভূমি। গৃধ্রশ্রেণী, অর্দ্ধদগ্ধ নরদেহাবলি, এবং ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কপাল ও অস্থির স্তূপ প্রভৃতি শ্মশানের যাবতীয় বীভৎস দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তান্ত্রিকমতে পূজার সমস্ত আয়োজন হইল। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলিদানের পূর্ব্বে স্নান করাইবার জন্য নদীতীরে লইয়া গেলেন। সে স্থানে কপালকুণ্ডলা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন করিলেন। তখন নবকুমার তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা ভবানীর ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পরস্পরে বাদানুবাদ চলিতেছে, এবং নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলপূর্ব্বক ফিরাইবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে কপাল-কুণ্ডলার পদতলস্থ তীরভূমি ভগ্ন হইল, এবং তিনি নিম্নস্থ গভীর নদীতে পতিত [illegible] নবকুমারও তৎক্ষণাৎ নদীতে [illegible] উভয়েই কিয়ৎক্ষণ অদৃশ্য হইলেন [illegible] নবকুমারকে টানিয়া কূলে উঠাইলেন, [illegible] দেখা গেল না, এবং তাঁহার [illegible] এই স্থানেই গল্প শেষ

হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকগণ বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন ; কারণ, তাঁহারা পরিশেষে সকলের মিলন ও চিরকাল সুখে বাস এইরূপ চিরপ্রথানুযায়ী উপসংহারেরই পক্ষপাতী।

'মৃণালিনী' সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ, এবং অনেকে এইখানিকেই বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার্হ পুস্তক বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিন্তু এই স্থানেই বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণ বিবরণ শেষ করিতে হইল। এই সাহিত্য অনেক বিষয়ে নিস্তেজ, নিকৃষ্টভাবাপন্ন ও মূল্যহীন হইলেও, ইহার মধ্যে এমন বস্তু আছে, যাহা হইতে ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট আশা করা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃতি প্রধানতঃ অনুকরণপ্রবণ, কিন্তু গ্রীস্ ভিন্ন অপর কোন্ দেশের সাহিত্য তরুণ বয়সে আত্মনির্ভরতা ও মৌলিকতা দেখাইয়াছে? সৌন্দর্য্য এবং সত্যের আকর সেই পবিত্র দেশ (গ্রীস্) হইতে কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইয়া য়ুরোপের পশ্চিমাঞ্চলস্থ জড়ভাবাপন্ন মনুষ্য-সমাজকে পুনঃ পুনঃ উদ্বোধিত করিয়াছে। ল্যাটিন কবি-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন ও প্রকৃতিপ্রণোদিত কবি হরেস্ গ্রীস দেশ হইতে শিক্ষিত হইলেও নূতন আকারের কবিতা প্রচারিত করিতে পারিলে, তাহাকেই মৌলিকতার চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎকালে 'অনুকারী'

শব্দ কেবল ল্যাটিন গ্রন্থকারগণের অনুকরণকারীর প্রতিই প্রযুক্ত হইত। কোনও গ্রন্থকে অত্যুৎকৃষ্ট আখ্যা দিলে, তাহা গ্রীক গ্রন্থের অনুকরণ বলিয়া বুঝা যাইত। রোমরাজ্যের পতনের পর য়ুরোপ যে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, সেই নিদ্রা হইতে পুনরুত্থানের পর য়ুরোপ প্রথমে গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থকারগণের অনুকরণ ও অনুবাদেই আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে। দান্তে কি অনুকরণলেশশূন্য ছিলেন? ইহা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইতে পারে যে, এ দেশের লোক য়ুরোপীয় ভাবসমূহ কখনও যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ মনে হইতে পারে যে, আমাদের সাধনার ফল কেবল ভাক্ত মর্ম্মগ্রাহিতার বাহ্যিক চাকচিক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু সকল বস্তুই একদিনে লাভ করা যায় না। এক কালে ইহাও তুল্যরূপে অসম্ভব বোধ হইতে পারিত যে, ল্যাটিন ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে যে সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে, এবং পুরাকালের ইতিবৃত্তের অনুশীলন হইতে পাশ্চাত্য কেলটিক ও টিউটনিক জাতিগণের মধ্যে এক্ষণে পরিদৃশ্যমান জ্ঞানবিটপী শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইবে। আপাততঃ বোধ হইতে পারে বটে যে, বাঙ্গালী জাতি কর্ম্মক্ষেত্রেও যেমন, চিন্তাক্ষেত্রেও [illegible]নই—যথার্থ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে [illegible]ভাবতঃ [illegible]। কিন্তু য়ুরোপে জ্ঞান-

চর্চ্চার পুনরুজ্জীবন কোমল ও নমনীয়স্বভাব ইটালীয়ানদিগের দ্বারাই আরব্ধ হইয়াছিল। অতএব, এরূপ কল্পনা অসঙ্গত নহে যে, বাঙ্গালী জাতি—যাহাদিগকে 'স্পেক্টেটর্' এসিয়া-খণ্ডের ইটালিয়ান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—এক্ষণে য়ুরোপীয় ভাবসমূহ এ দেশে রোপিত করিয়া, এবং ভবিষ্যতে উত্তর ভারতবর্ষের অধিকতর কার্য্যক্ষম এবং উদ্ভাবনী-শক্তি-সম্পন্ন জাতিগণ যাহাতে উহা সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া একটি মহৎ কার্য্য সাধিত করিতেছে

সমাপ্ত

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—আর্ট পেপারে মুদ্রিত ১৯ খানি প্রতিকৃতি ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য কাগজের মলাট ১৲ টাকা, বাঁধা ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

রাজা দক্ষিণারঞ্জনমুখোপাধ্যায়—৪৬ খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও স্যর আশুতোষ চৌধুরী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণাক্ষরযুক্ত বাঁধাই। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

হেমচন্দ্র ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড—১২৪ খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত স্মৃতিকথা সম্বলিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৲ দুই টাকা মাত্র। বাঁধাই 'রাজা দক্ষিণারঞ্জনের' অনুরূপ।

সেকালের লোক—তিন জন বিস্মৃতকীর্ত্তি বাঙ্গালীর জীবনবৃত্ত। ৩৮ খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র সম্বলিত। বাঁধাই "হেমচন্দ্রে"র অনুরূপ। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—৩৬ খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র সম্বলিত। বাঁধাই "সেকালের লোকের" অনুরূপ। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র—৫৫ খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্র সম্বলিত। উৎকৃষ্ট কাপড়ের বাঁধাই, স্বর্ণাঙ্কিত। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

কর্ম্মবীর কিশো[illegible]দ্র—আর্ট পেপারে মুদ্রিত ২৩খানি [illegible] একখানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত। বাঁধাই '[illegible]দ্রের অনুরূপ। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

রঙ্গলাল—(যন্ত্রস্থ)। অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য চিত্রে পরিশোভিত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

MEMOIRS OF KALI PROSSUNNO SINGH—সচিত্র। মূল্য ১॥• দেড় টাকা মাত্র।

মন্মথবাবুর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

অবরুদ্ধা—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী'র সুললিত পদ্যানুবাদ। মাইকেলের দুই খানি চিত্র এবং অনুবাদকের একখানি চিত্র সংযুক্ত। মূল্য আট আনা মাত্র।

LIFE AND WRITINGS OF GRISH CHUNDER GHOSE—'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জীবনী, পত্রাবলী, বক্তৃতা ও রচনাবলী রয়েল অক্টেভো প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা। সচিত্র। মূল্য অল্প দিনের জন্য পাঁচ টাকা মাত্র।

DEATHLESS DITTIES—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালার বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতৃগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুলির শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ-কৃত সুললিত ইংরাজী [illegible]ানুব[illegible]। 'বেঙ্গলী'র মতে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের [illegible]কাশিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সুন্দর অনু[illegible]তে পারেন নাই। ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত সুন্দর প্রচ্ছদপট [illegible]কা মাত্র।